বিকাশ

।। স্বদেশবোধ ও স্বজাতিবোধ ।।

যে স্বদেশবোধ বা স্বজাতিবোধের উন্মেষমাত্র দেখা গিয়েছিল মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী"তে, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর তারই প্রবল বিকাশ, কখনও বা অপরিমেয় উচ্ছ্বাস, নির্গত হয়েছিল তৎকালীন ঐতিহাসিক নাটকের মাধ্যমে। ঐ কালটিকেই আমরা ঐতিহাসিক নাটকের বিকাশ-পর্বের আরম্ভ ব'লে ধরে' নিতে পারি। এখন থেকে যে সমস্ত ঐতিহাসিক নাটক রচিত হ'তে লাগল তার মূল কথা দেশানুরাগ, জাতি-ঐক্য। বাঙলাদেশের তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের মুখ্যধারাগুলি এই নাট্যশরীরে প্রবাহিত। তাই ঊনবিংশ শতকের জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমিকা, এই শ্রেণীর নাটকের আলোচনায়, অপরিহার্য। আমরা প্রথমেই যথাসম্ভব সংক্ষেপে এই আন্দোলনের পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার জাতীয় আন্দোলনের আলোচনায়, প্রথমেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবের কথা বলতে হয়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী যুব-সম্প্রদায়ের মনে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। এ-বিষয়ে গত শতকের চতুর্থ দশক থেকে হিন্দু-কলেজের ছাত্র-সমাজের গোষ্ঠী-গত আন্দোলনের কথা পূর্বাধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে এইটুকুই শুধু লক্ষণীয়, বাঙলার স্বদেশবোধের আন্দোলনের প্রথম যুগের হোতারা অধিকাংশই উচ্চ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার প্রথম জীবনে উঁচু সরকারী চাকুরীর অভিলাষী ছিলেন, এবং অভীষ্ট লাভে বঞ্চিত হয়ে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ান। যেমন, মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগের এই তিনজন হোতার নাম করা যেতে পারে। এঁরা প্রত্যেকেই সিভিল সার্ভিসের ব্যর্থ পদপ্রার্থী, এবং পরবর্তী জীবনে স্বদেশী আন্দোলনের পুরোহিত।

পাশ্চাত্ত্য ধর্ম ও সভ্যতার সর্বপ্লাবী শক্তির বিরুদ্ধে এ সময়ে শিক্ষিত বাঙালীর একাংশের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম এঁদের

মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয়। হিন্দু কলেজে শিক্ষিত হয়েও তিনি ইংরাজী-সর্বস্বতার বিরোধিতা করেন। লেখায় এবং কথাবার্তায় তিনি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতেন না। বাঙালী যুবকের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণেও তাঁর আপত্তি ছিল প্রবল। তাঁর আয়োজিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' এবং ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। এ-যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাট্যকার, মহর্ষির পুত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আমল হইতেই প্রকৃতপক্ষে স্বদেশীভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উক্ত পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী লিখিয়া সর্বপ্রথম দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন।····· বলিতে গেলে, পূর্বের আদি ব্রহ্মসমাজই তখন স্বদেশীভাবের প্রধান কেন্দ্র ছিল।"—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ঃ বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়।—পৃঃ ১৩১।

ঐ সময়ে সর্বৈব ইংরেজিয়ানার আরও দু'জন ঘোর বিরোধী হ'লেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' থেকে জানা যায়, কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে তিনি এমন একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে ফেল্‌লে সদস্যদের শব্দ-পিছু এক পয়সা জরিমানা দিতে হ'ত। তাঁরই পরিকল্পনায় নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল (চৈত্র) মাসে ঐতিহাসিক 'হিন্দুমেলার' আয়োজন করেন। জাতীয় আন্দোলনে এই মেলার দান অপরিমেয়। এখানে যে শুধু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ঘোষিত হয়েছিল তাই নয়, দেশীয় প্রথায় স্বদেশবোধের উদ্বোধের এমন ব্যাপক আয়োজন এর পূর্বে আর ঘটেনি। এই মেলায় জাতীয় সঙ্গীত রচনার যে সূচনা দেখা দেয়, তার পরিব্যাপ্তি বহুদূর অবধি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই মেলার জন্য গান রচনা করেছেন। এই মেলার আদর্শ তাঁর কৈশোর জীবনে এমন গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে যায় যে পরিণতকালে জাতির মুক্তি-আন্দোলনের আদর্শ নেতাকে তিনি মানুষের এই বৃহত্তর মিছিল থেকেই নির্বাচন করেছিলেন, উচ্চ বক্তৃতামঞ্চ থেকে নয়।[১] তা ছাড়া,আমাদের আলোচ্যযুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথও এই মেলা থেকেই স্বদেশবোধের কৈশোর দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শুধু হিন্দু-মেলার আয়োজন করেই ক্ষান্ত হলেন না নবগোপাল মিত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে জাতীয়তাবোধকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চাইলেন তিনি। দেবেন্দ্রনাথের অর্থ সাহায্যে তিনি National Paper প্রবর্তন করলেন। National

১। ধনঞ্জয় বৈরাগী স্মরণীয়।

আন্দোলনের ঝড় বয়ে গিয়েছিল তা সহজে ভোলবার নয়। নাটকটির বিশেষ আলোচনার প্রসঙ্গে আমরা বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে দেখবার চেষ্টা করব।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে জাতীয় আন্দোলনের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকুও অপূর্ণ থেকে যাবে। তা হ'ল, এই শতকেই প্রাচীন ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের গবেষণার তাগিদ। এ বিষয়ে, Charles Wilkins, Sir William Jones, Anequetil du Perron—প্রভৃতির নাম স্মরণীয়। গত শতকের প্রথম তিন দশকে Colebrooke এবং H. H. Wilson প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দান রেখে গেছেন। তারপর ১৮৪০ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে Roth প্রকাশ করেন তাঁর 'Literature and History of Vedas', Max Muller তাঁর ঋগ্‌বেদ এবং প্রাচীন হিন্দুর অতীত গৌরবের বিষয়ে নানা বই। Prinsep ও Cunningham প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের লুপ্ত পরিচয় পুনরাবিষ্কার করেন। ঐ সব পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দৃষ্টান্তে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাঃ রামদাস সেন প্রমুখ এদেশীয় পণ্ডিতগণও ভারতের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী হন। বঙ্কিমচন্দ্রও ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন প্রবর্তন ক'রে বাঙালীকে ইতিহাস রচনায় আহ্বান জানালেন এবং নিজেও এ ব্রত গ্রহণ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ইতিহাস রচনার আহ্বানে যারা সাড়া দিলেন, তাঁদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অন্যতম। এঁর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একদা বলেছিলেন, "রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন।"

যাই হোক এই সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে বাঙালীর চিত্তে প্রবল কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিল। জাতির এই কর্মচাঞ্চল্যই এ যুগে ঐতিহাসিক নাটকের সমুন্নতির কারণ। পূর্বাধ্যায়ের আলোচনায় প্রতীত যে, অন্য সব নাটকের তুলনায় ঐতিহাসিক নাটকেই কর্মচক্র বা action-এর প্রাবল্য। নাটকের অন্য একটি ধর্ম দ্বন্দ্ব বা conflict-এর অবকাশ এই শ্রেণীর নাটকে কম। এক্ষেত্রে, ঐতিহাসিক নাটকের পূর্তি জাতির কর্মোন্মাদনার মুখাপেক্ষী। এ যুগে বাঙালীর মনে যে অভূতপূর্ব কর্মপ্রেরণা আসে, তার পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

"আজ বঙ্গভূমির আনন্দ উৎসব ভারতবর্ষের চারিদিক হইতে শুনা যাইতেছে। আজ ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে যে নবজাতির জন্মসঙ্গীত গান হইতেছে, ভারতবর্ষের

দক্ষিণপ্রান্তে পশ্চিমঘাট গিরির সীমান্ত দেশে বসিয়া আমি তাহা শুনিতে পাইতেছি।” ……ইত্যাদি। (বালক, ১২৯২ পৌষ)

জাতির অতীত গৌরবের ইতিহাসকে আশ্রয় ক’রে শুধু যে এ সময় নাটকই রচিত হয়েছিল তা’ নয়, সৃষ্টিশীল সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐ একই ঐতিহাসিক প্রবর্তনা (urge) লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি লেখেন এই পর্বে। রমেশচন্দ্রের স্বদেশবোধ-চিহ্নিত শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি রচিত হয় ১৮৭৪ থেকে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে চারণ গানের রীতি পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক নাটকের উপর স্থায়ী প্রভাব রেখে যায়। বাঙলা সাহিত্যের এই দিক্‌টিও তৎকালীন জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে অস্পৃষ্ট থেকে যায়নি। রবীন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী এই সময়কার ঐতিহাসিক উপন্যাসের একজন স্মরেণ্য রচয়িত্রী। তাঁর ‘দীপনির্বাণ’ (১৮৭৬), ‘বিদ্রোহ’ (১৮৯০), ‘মিবাররাজ’, ‘ফুলের মালা’ (১৮৯৪) প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া হারানচন্দ্র রাহা, মদনমোহন মিত্র প্রভৃতি এ-বিষয়ে গৌণ লেখকের সংখ্যা অগণ্য। কাব্যের ক্ষেত্রে নবীনচন্দ্র সেনের ‘পলাশীর যুদ্ধ’ (১৮৭৫) অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর ‘ভারতগাথা’ এ সময়কার উল্লেখযোগ্য রচনা। ‘পলাশীর যুদ্ধে’ টড-কাহিনীর ছদ্মবেশ ধারণের প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন ক’রে সরাসরি ইংরেজের কাছে পরাধীনতা স্বীকারের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজি-শাসনের বিরুদ্ধে একটি চরণও লেখা হয়নি এতে। বরং ন্যায়দণ্ড হাতে ইংল্যাণ্ডের রাজলক্ষীকেই ভারতভূমিতে স্বাগত জানিয়েছেন কবি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মনে করিয়ে দিয়েছেন, ঐ ন্যায়দণ্ডটি স্খলিত হ’লে ইংরেজ প্রভুত্বেও যবনের দশা ঘটবে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, তখনকার তরুণ অভিনেতা এবং পরবর্তীকালে ‘সিরাজদ্দৌলা’ প্রভৃতি জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকের প্রখ্যাত রচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কাব্যটির নাট্যরূপ দেন এবং স্বয়ং Clive-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ’ন।

শুধু এই সব ঐতিহাসিক রচনাতেই নয়, এ-সময়কার অন্যান্য রচনাতেও এই যুগের বাঙালীর সমসাময়িক রাজনীতি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ চেতনার পরিচয় প্রকীর্ণ। একটি ছোট্ট উদাহরণ থেকেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। আমরা জানি, পৌরাণিক নাটকে জাতীয়তাবোধের অনুকূল অবকাশ নেই। ধর্ম সেখানে বড়। অথচ, এই সময়কারই একটি পৌরাণিক নাটকে সমসাময়িক জাতীয় আন্দোলনের ছাপ যে ভাবে পড়েছে তা’ ভাবলে অবাক হ’তে হয়। নাটকটির নাম হরিশচন্দ্র। রচয়িতা

মনোমোহন বসু ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এটি লেখেন। লেখক পুরাণচারিতার ফাঁকে ফাঁকে করভার-পীড়িত তৎকালীন ভারতবাসীর যে ছবিটি দিয়েছেন তা বাস্তবিকই কৌতূহলের। এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল :

"দে কর দে কর, রব নিরন্তর ;—করের দায় অঙ্গ জর জর।
সিন্ধুবারি যথা শুষে দিনকর। শোণিত শোষণ করে শতকর।
করদানে-নর নিকর কাতর, রাজা নয় যেন বৈশ্বানর।
আয়-কর শুনে গায় আসে জ্বর, অস্থিভেদী রথ্যা কর কি দুষ্কর।
লবণটুকু খাব, তাতেও লাগে কর! —কত আর কব মুনিবর!
মাদকতা-কর-ছলে রাজ্যময়, মদ্যের বিপণি নিত্যবৃদ্ধি হয়
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয়! হাহাকার রব নিরন্তর।"[১]

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, মনোমোহন বসু পূর্বোক্ত হিন্দু মেলায় স্বদেশী গান রচনা ক'রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

এইভাবে নাটকের মধ্যে, বিষয়ানুগ না হয়েও স্বদেশবোধের হঠাৎ অবতারণা অধিকাংশ রচনায় দেখা যায়। তাদের বিস্তৃত উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকুই মনে রাখবার যে, ইতিহাসাশ্রিত রচনার মধ্যে এই পর্বে সবচেয়ে বেশি সংখ্যা-সমৃদ্ধ ছিল উপন্যাস, তারপরেই নাটক ও কবিতা। এর মধ্যে, উপন্যাস ও কবিতা আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। আমরা এবার এ-যুগের ঐতিহাসিক নাটকের বিশেষ পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ॥

ঐতিহাসিক নাটকের দ্বিতীয় বা বিকাশ-পর্বের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় নাট্যকার হ'লেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমরা ইতিপূর্বে এই পর্বের ঐতিহাসিক নাটকের অন্যতম লক্ষণ হিসাবে স্বদেশবোধ বা স্বজাতিবোধের কথা উল্লেখ করেছি। এই বিশেষ দিকটির কথা মনে রাখলে, মানতেই হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথই এই পর্যায়ের অন্যতম প্রতিনিধি স্থানীয় নাট্যকার। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির প্রাণশক্তি সমকালীন রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে আহৃত। এই যুগে উন্মেষিত জাতীয়তা-বোধের ভাবনাগুলি তাঁর নাটকের অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় সূক্ষ্মভাবে রূপান্তরিত। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক রাজনৈতিক চেতনার এই প্রত্যক্ষ প্রভাব

১। ডঃ সুকুমার সেন-এর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' থেকে উদ্ধৃত।

তাঁর ইতিহাসের বোধকেও স্পর্শ করেছিল। ইতিহাস-তথ্যের অন্ধ অনুসরণে তাঁর আগ্রহ ছিল না। বরং তাঁর সদ্য-লব্ধ জাতীয় চেতনায় বিধৃত বক্তব্যের প্রবণতা অনুযায়ী তিনি অনুকূল ঘটনা কল্পনা করে নিতেন। ইতিহাসের সুপরিজ্ঞাত ঘটনাকেও অল্প বিস্তর পরিবর্তন ক'রে নিতে দ্বিধা করতেন না। এজন্য অনেকেই তাঁর নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করতে চাননি। কিন্তু, এ সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে ভেবে দেখা উচিত, ইতিহাসের ঘটনাকে যথাযথ বিবৃত করার কোনো আবশ্যিক দায়িত্ব ঐতিহাসিক নাটকের আছে কি না। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমরা প্রথম অধ্যায়ে করেছি। তার পুনরুক্তি না করে' এই প্রসঙ্গে স্বয়ং নাট্যকার কি ভাবতেন দেখা যাক। জনৈক পত্র লেখকের অভিযোগের উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর একটি চিঠির এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

"ইহা বুঝা উচিত, নাটক ও ইতিহাস এক জিনিষ নহে। কোন দেশের কোন নাটকেই ইতিহাস সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষিত হয় না।"[১] এর থেকে অনুমান করা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সচেতনভাবেই ইতিহাসের অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করেছেন। তাঁর এ শিল্পবোধের সমর্থন রয়েছে একদিকে রবীন্দ্রনাথে অন্যদিকে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমালোচক-মহলে।[২] ইতিহাসের অনুক্ত ঘটনা বা চরিত্রবিশেষকে নাট্যকার সৃষ্টি ক'রে নিতে পারেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরও নিশ্চয়ই সে-অধিকার ছিল। এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর এ-অধিকার সম্বন্ধে অতি মাত্রায় সচেতন ছিলেন। সুতরাং, ইতিহাসকে অবিকল রক্ষা না করা সত্ত্বেও, বরং করা হয়নি ব'লেই, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকের মূল্যবোধ অন্যত্র।

একথা ঠিক যে, সাধারণভাবে নাটকে নাট্যকারের ভূমিকা নিরপেক্ষ দ্রষ্টার। ঘটনা বা চরিত্র-বিশেষকে প্রমূর্ত করতে হ'লে, নির্মাতার পক্ষে কিছুটা দূরত্ব অপরিহার্য। নাট্যকারকে, তাই, সৃষ্ট পাত্রপাত্রীর মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে হয়। নাট্যকার যদি নিজেই একটি চরিত্র-বিশেষে পরিণত হন, তাহ'লে নাটকের বাস্তবানুগত্যের সুর ব্যাহত হয়। কিন্তু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্যই এই যে তিনি তাঁর পাত্রপাত্রীদের মধ্যে মাঝে মাঝে নিজেই অবতীর্ণ হয়েছেন। ফলে, নাট্যশিল্পের সাধারণ ধারণা তাঁর নাটকে প্রায়ই বিপর্যস্ত। তাই সমালোচকেরা তাঁর নাটকে ইতিহাসের অমর্যাদা লক্ষ্য

১। বড়বাজার লাইব্রেরীর সাম্মানিক সম্পাদক (Hony. secy.) কেশবপ্রসাদ মিশ্রকে লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্রাংশ।

২। প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, ইতিহাসের উপলক্ষ থাকলেও তাঁর নাটক আসলে রোমান্টিক। কেউ বা লক্ষ্য করেছেন, অপরিমিত হৃদয়োচ্ছ্বাস।

কিন্তু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের মূল্যায়নে একথা কিছুতেই ভোলা উচিত নয় যে, সমকালীন যুগ-চৈতন্যকে বাদ দিয়ে সার্থক ঐতিহাসিক নাটক রচনা অসম্ভব। বস্তুত, ঐতিহাসিক রচনার মৌল প্রেরণাই যে জাতীয় চেতনা একথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। আরও মনে রাখা উচিত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সময়ে, স্বদেশ বা স্বজাতিবোধ বাঙালীর জীবনে একটি সম্পূর্ণ নূতন অনুভূতি। আজ, এক শতাব্দীর দূরত্ব থেকে ঐ জাতীয় আন্দোলনের নিরপেক্ষ দ্রষ্টা হবার যে অবকাশ আছে ঊনবিংশ শতাব্দীর সচেতন বাঙালীর কাছে তার সম্ভাবনাও ছিল না। জাতীয় ভাবাশ্রিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পক্ষেও তাই নাট্যকারোচিত ব্যবধান রক্ষা করা সব সময়ে সম্ভব হয়নি। বরং জাতিকে এই স্বদেশবোধের কথা শোনাতে কৃতসঙ্কল্প হয়েই তিনি নাট্য-রচনায় ব্রতী হন। একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন:

"হিন্দুমেলার পর হইতে, কেবলই আমার মনে হইত কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, কটকে থাকিতেই আমি 'পুরুবিক্রম' নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম।"—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—পৃঃ ১৪১।

শুধু 'পুরুবিক্রম' নয়, তাঁর অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটকই তাই। লক্ষণীয় যে, এই স্বদেশপ্রীতিই তাঁর নাটকে যেমন দোষ হিসাবে নিন্দিত, আবার গুণ হিসাবে নন্দিতও। দোষ, কেননা এর ফলে, সমালোচকেরা মনে করেন, তাঁর নাটক বিশুদ্ধ শিল্পাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রচারধর্মী হয়ে উঠেছিল। গুণ, কেননা স্বদেশ-প্রেমেরই গাঢ় উপলব্ধিতে তিনি বাঙলা নাটকে এক বিচিত্রধারা অবারিত করলেন।

অবশ্য একথা ঠিক যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে কালের উত্তরণ নেই। সাময়িকতার মূল্যেই তা পরিসীমিত। অনেকে অবশ্য এর জন্যে তাঁর স্বদেশপ্রীতিকে দায়ী করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, স্বদেশবোধই তাঁর নাটকের সাময়িক মূল্যের কারণ নয়। স্বদেশবোধকে অবলম্বন করে' শাশ্বত মূল্যের নাটকও রচিত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে পারেননি তার কারণ স্বদেশবোধ সম্বন্ধে তাঁর অপরিণত

উপলব্ধি। তাঁর স্বদেশবোধে যে পরিমাণ উচ্ছ্বাস ছিল সে পরিমাণ উদ্‌যাপন ছিল না। এই গভীরতার অভাবেই তাঁর দেশহিতৈষণাতে এমন কোনো বাণী নেই যা দেশের হয়েও দেশাতীত, যুগের হয়েও যুগাতীত। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'তেও তৎকালীন অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিভাস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কবির অনুভূতির গভীরতায় একটি লোকায়ত রাজনৈতিক আন্দোলন সাহিত্যের শাশ্বত অমরাবতীতে লোকোত্তীর্ণ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনায় কিন্তু এ ধরনের উত্তরণ ক্বচিৎ ঘটেছে। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশবোধের চিত্রের চেয়ে স্বদেশবোধের প্রচারই প্রাধান্য পেয়েছে। একে তিনি নাটকের অঙ্গীভূত করে নিতে পারেননি। তাঁর নাটকের মধ্যে ঊনবিংশ শতকের স্বদেশবোধের নবজাগ্রত চেতনা, এবং মূল ইতিহাসের কাহিনী পাশাপাশি দু'টি সমান্তরাল ধারায় বিভিন্ন। একটি অন্যটির অঙ্গীকৃত হ'তে না পারায় নাটকের স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ থাকেনি। অথচ, সার্থক ঐতিহাসিক নাটকের মূল কথাই হ'ল ইতিহাসের বৃহত্তর বোধের সঙ্গে বর্ণিত কাহিনীর সমন্বয়। তা না হলে ঐতিহাসিক পটভূমিকারই আর কোনো অর্থ থাকে না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে, আধুনিক যুগচেতনার এই ধরনের ইতিহাস-নিরপেক্ষ প্রক্ষিপ্ত রূপায়ণ মোটেই দুর্লভ নয়। তাঁর 'পুরু-বিক্রম' নাটক থেকে এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। নাটকটির বিষয় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ঘটনা। অথচ নাটকটির গোড়াতেই একটি কল্পিত গায়িকার কণ্ঠে যে-গানটি দেওয়া হ'ল তার কথাগুলি—

"মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান,
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান।
ছিন্নভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়!"[১]

বলা বাহুল্য, এটি ঊনবিংশ শতকের সদ্যোলব্ধ অখণ্ড ভারত-বোধের কথা। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এই ধরনের কোনো চেতনার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়

১। এটি আসলে, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। হিন্দুমেলার বার্ষিক অধিবেশনে গীত হ'ত।

না। শুধু তাই নয়। এই গানটির সম্পর্কে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যে মন্তব্য করেছিলেন, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এই নাটকটির একটি চরিত্রের মুখে ঠিক তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন,

"এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক।" (বঙ্গদর্শন, প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন, ১৮৭৩ খ্রীঃ)। আর ঠিক তার একবছর পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখলেন ঃ

"ঐলাবিলা।······যাও, তুমি ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে এই গানটি গাওগে। যতদিন না হিমালয় হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি এক উৎসাহানলে প্রজ্বলিত হয়, ততদিন তোমার কার্য শেষ হ'ল এরূপ মনে ক'র না।" ······১ম অঙ্ক ঃ ১ম গর্ভাঙ্ক।

এইভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে তাঁর সমকালীন জাতীয় আন্দোলনের বহু প্রত্যক্ষ পরিচয় অবারিত করা যেতে পারে। কিন্তু আপাতত সে কার্য থেকে বিরত হ'য়ে জ্যোতিরিন্দ্র-মানসের বিস্তৃততর পরিচয় নেবারই চেষ্টা করা যাক।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলি বুঝতে গেলে তাঁর স্বদেশবোধের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় থাকা আবশ্যক। আমরা আগে বলেছি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশবোধ তেমন কোনো স্পষ্ট পরিণত রূপ লাভ করেনি। কিন্তু এজন্যে কেউ যেন না মনে করেন, আমরা তাঁর স্বদেশানুরাগকে অস্বীকার করতে চাইছি। তাঁর স্বদেশ বা স্বজাতির প্রতি অনুরাগ তো ছিলই। বোধ হয় কিছু বেশী মাত্রাতেই ছিল। তাঁর জীবনস্মৃতি থেকে জানা যায়, কৈশোর থেকেই তাঁর জাতীয়ভাবের সাধনার সুরু। উনিশ কুড়ি বছর বয়সেই তিনি নবগোপাল মিত্রের অনুরোধে জাতীয় ভাবের কবিতা লেখেন।[১] তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত অক্ষয়কুমার দত্তের অতীত গৌরব-উদ্দীপক কাহিনীগুলি অভিনিবেশের সঙ্গে পাঠ করেন। হিন্দু মেলার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। বাড়িতেও, অন্যান্য সমবয়সীর সহযোগিতায় ঐ বালক বয়সেরই উপযোগী একটি Masonic সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই Masonic সভার পরবর্তী সংস্কৃত রূপ 'সঞ্জীবনী সভা'। এটিও তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। এ সমস্ত থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশানুরাগ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়।

১। "জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান
মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান?
ভারতের পূর্ব্বকীর্ত্তি করহ স্মরণ,
রবে আর কতকাল মুদিয়ে নয়ন," ইত্যাদি।

কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হয়, জাতীয়তার চেতনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানসে কোনো স্পষ্ট পরিণত রূপ লাভ করতে পারেনি। এবিষয়ে তাঁর বোধ সর্বদাই দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়াচ্ছন্ন। স্থির সিদ্ধান্তের অভাবই তাঁর জাতীয় চেতনার বৈশিষ্ট্য। তিনি যেমন তৎকালের প্রবল জাতীয়তাবাদকে পূর্ণকণ্ঠে সহানুভূতি জানাতে পারেননি, তেমনি তার বিরোধিতা করাও ছিল তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য। উগ্র জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তিনি জানিয়েছেন :

"(দেশানুরাগ) অতিরিক্ত হইলে, অন্য জাতির প্রতি অত্যাচার এবং অসার জাতীয় অহঙ্কার উৎপন্ন হয়।"[১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই উগ্র স্বদেশানুরাগীকে ব্যঙ্গ করে নাম দিয়েছেন 'জাতীয়তার ভূতগ্রস্ত।'[২] আবার যাঁরা স্বাদেশিকতা বা স্বাজাত্য-বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন, তাঁদের সম্বন্ধেও বলেছেন :

"(দেশানুরাগের) ন্যূনতা হইলে, জাতির অধিকার সকল সেরূপ উপযুক্ত রূপে সমর্থিত হয় না; সুতরাং অন্যজাতির অনধিকার প্রবেশের প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং জাতীয় শক্তি ও জাতীয় অনুষ্ঠানের প্রতি অতিরিক্ত অমর্যাদা করিলে উন্নতি উদ্যম নিরুৎসাহিত হয়।"[৩]

বলা বাহুল্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই উভয় দলকেই বর্জন করতে চেয়েছেন। তাঁর আদর্শ ছিল অন্যরকম। সে-সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :

"কেহ না মনে করেন আমরা জাতীয় ভাবের বিরোধীপক্ষ। আমরা প্রকৃত গোঁড়ামিশূন্য জাতীয়তার ভক্ত। অন্ধ বিকৃত জাতীয়তার ভক্ত নহে।"[৪]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই অভীষ্ট দেশানুরাগ সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশবোধের আদর্শে প্রভাবিত। বঙ্কিমচন্দ্র এই সময়ে তাঁর ধর্মতত্ত্বের চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন :

"ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পর সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব; ......দেশপ্রীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতি, উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এ-বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমধর্মিতা থাকলেও, লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের স্পষ্ট প্রতীতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছিল না। তিনি এটুকু বুঝেছিলেন,

---

১। 'জাতীয়তার নিবেদনে অনতিজাতীয়তার বক্তব্য'—প্রবন্ধ মঞ্জরী : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।
২। 'জাতীয়তা ও বিজাতীয়তার উপদ্রব'—ঐ
৩। 'জাতীয়তার নিবেদনে অনতিজাতীয়তার বক্তব্য'—ঐ
৪। 'জাতীয়তা ও বিজাতীয়তার উপদ্রব'—ঐ

সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের 'অতিজাতীয়তা'র ভাবটি সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। এবং সেই কারণে এটি বর্জনীয়ও। কিন্তু এমন কোন একটি বলিষ্ঠ বিকল্প তিনি পাননি যাকে তিনি স্থিরভাবে আশ্রয় করতে পারতেন। মনের এই দোলাচল অবস্থার জন্যই, দেখা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কখনও তাঁর সমসাময়িক জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে, পরক্ষণেই আবার সেই আন্দোলনের দূরতম ব্যবধানে তাঁর অবস্থান। কখনও তিনি দেশলাই-এর কারখানা স্থাপন করতে গিয়ে নির্বাপিত ব্যর্থতা নিয়ে ফিরেছেন, কখনও বা বিদেশী ষ্টীমার কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ষ্টীমারের খোল কিনে ভরাডুবি হয়েছেন। একথা অনস্বীকার্য যে, এই সমস্ত অস্থির-চিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াসের আপাত-ব্যর্থতার মধ্যেই ভবিষ্যৎ সার্থকতার সম্ভাবনা নিহিত। সেই দিক দিয়ে আমাদের স্বদেশবোধের ইতিহাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দান অসামান্য। কিন্তু, একটি স্থিরতর লক্ষ্যের অভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশবোধ কিছুটা উৎকেন্দ্রিক না হয়ে পারে নি, একথা অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিচারণায় বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের) স্বাদেশিকতার অকুণ্ঠ প্রশংসার আড়ালে এ বিষয়ে যে ইঙ্গিতটুকু করেছিলেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত ষ্টীমার ব্যবসায়ের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"এই সকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা সে একলা তিনি স্বীকার করিয়াছেন আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবি অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারংবার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন; সে বন্যা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে।"—(জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ। পৃঃ ১৬০)। লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে জ্যোতিরিন্দ্র-মানসের অস্থিরতার প্রতি ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

জ্যোতিরিন্দ্র-মানসের এই বিশেষ ধরনের স্বদেশবোধ তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এরই ফলে তাঁর ঐতিহাসিক নাটক চারটিতে স্বদেশ-বোধের কোনো ধারাবাহিক বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। বরং তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'পুরু-বিক্রমে' জাতীয়তাবোধের যে উদ্দীপনা আছে, পরবর্তী 'সরোজিনী' ও 'অশ্রুমতী'তে তা' ক্রম-ক্ষীয়মাণ। শেষ ঐতিহাসিক নাটক 'স্বপ্নময়ী'-তে এর পরিচয় পাওয়াও দুষ্কর। জনৈক সমালোচকের মতে, "স্বদেশ

প্রেমের উদ্বোধন যদি নাট্যকারের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তবে এই নাটকে (অর্থাৎ স্বপ্নময়ীতে) তাহা ব্যর্থ হইয়াছে"।[১]

এই ধরনের অসঙ্গতির জন্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটককে কেউ কেউ 'রোমান্টিক' নাটক বলার পক্ষপাতী। এ-অসঙ্গতির কারণ আর কিছুই নয়, তাঁর স্বদেশবোধের স্পষ্ট কোন পরিণতির অভাব, সংশয়াচ্ছন্ন মনন এবং অনুত্তরিত যুগ-জিজ্ঞাসা।

জাতীয়তার উদ্বোধের স্বপ্ন নিয়ে নাট্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'লেও পূর্বোক্ত কারণে তিনি আদর্শ থেকে ক্রমশ দূরবর্তী হয়েছেন। পরাধীনতার জ্বালা তাঁর নাটকের স্থানে স্থানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেও, তৎকালীন ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাস-অবলম্বনে একখানি নাটকও তিনি লেখেননি। বস্তুত সে যুগের বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিকদের কেউই ইংরাজ শাসকদের স-মূল উচ্ছেদের কথা বলেন নি।[২] স্বভাবতই সংশয়াচ্ছন্ন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐ বিষয়ে আরও যে অস্থির-সিদ্ধান্ত হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি। একই প্রবন্ধে স্বাধীনতার জয়গান গাওয়ার পর তৎকালীন ইংরাজ শাসক সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন:

"আজ যদি ইংলণ্ড আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যায়, আমাদের এতটুকুও কি বলসঞ্চয় হইয়াছে যে, নিজবলে আমরা আপনাদিগের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিতে পারি?......ইংলণ্ডের কামান বন্দুক বেয়নেট শত্রুর আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে সত্য—কিন্তু ইংলণ্ড আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে কি আমরা শিশুর ন্যায় একেবারে অসহায় ও নিরুপায় হইয়া পড়ি না?" (ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, প্রবন্ধ-মঞ্জরী: জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)। তাই তাঁর জাতীয়তার ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটকগুলির একটিতেও ইংরেজ-শাসিত ভারতের ইতিহাস কোথাও সরাসরি গৃহীত হয়নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকে মুসলমান যুগের হিন্দু শৌর্যেরই বন্দনা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'পুরু-বিক্রমে' অবশ্য মুসলমান পূর্ব যুগের কাহিনী গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সেখানেও লক্ষ্য হিন্দু রাজার শৌর্য-বন্দনা। কিন্তু বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে পরবর্তী তিনটি নাটকেরই কাহিনী-কাল মুসলমান আমল। দ্বিতীয় নাটক 'সরোজিনী'তে মেওয়ারের রাজা লক্ষ্মণসিংহের

১। বাংলা নাটকের ইতিহাস: অজিতকুমার ঘোষ, পৃঃ ১১৫।

২। স্মরণীয়: বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীন সেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রাম পাঠান-রাজ আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে।[১] 'অশ্রুমতী'তে প্রতাপ-সিংহের সংগ্রাম মোঘলরাজ আকবরের সঙ্গে। চতুর্থ নাটক 'স্বপ্নময়ী'র পরিকল্পিত বিদ্রোহও মোঘল সম্রাট আরংজীবের বিরুদ্ধে, এর থেকে স্বতঃই মনে হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন জাতীয়তাবোধের হিন্দু প্রবণতায় ধরা না দিয়ে পারেননি। এ সম্বন্ধেও তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত মানসের কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। ভারতবাসীর অখণ্ড জাতীয়তার উপলব্ধি সম্বন্ধে তিনি সংশয় প্রকাশ ক'রে লিখেছেন :

"……প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভারতবর্ষীয়দিগকে একটি সমগ্র জাতি বলা যায় কিনা? ভারতবর্ষীয় বলিলে ভারতবর্ষবাসী মুসলমান ও খ্রীষ্টান তাহার অন্তর্ভুক্ত হয় কিনা? যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া শুদ্ধ হিন্দু জাতিকেই ধরা যায়—তাহা হইলেও এক্ষণে হিন্দুগণের যেরূপ অবস্থা, তাহাদিগকে কি একজাতি বলিয়া মনে হয়?"

—ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা—প্রবন্ধ মঞ্জরী : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সব সংশয়াত্মক প্রশ্নের কোনো সদুত্তর খুঁজে পাননি। তাই তাঁর জাতীয়তাবোধে সঙ্কলিত ঐতিহাসিক নাটকে তিনি বারংবার পথচ্যুত হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত হিন্দু জাতীয়তাবোধে তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল না। আবার মুসলমান সমাজের যথার্থ স্থান সম্পর্কেও তিনি সংশয়িত ছিলেন। তাই এ-বিষয়ে তাঁর এক ধরনের অতি-সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। বৃহত্তর মানবিকতাবোধ থেকে তিনি সম্প্রদায় নির্বিশেষে মুসলমানকেও তাঁর নাটকে সহজ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। যেমন : 'সরোজিনী' নাটকের রোষেনারা, বা 'অশ্রুমতী'র সেলিম। কিন্তু তৎকালীন হিন্দু-জাতীয়তাবোধের অতি-সচেতনা এই মানবিকতাবোধকে বেশি দূর অগ্রসর হতে দেয়নি। ফলে এই শ্রেণীর চরিত্র স্বাভাবিক বিকাশের পথে যায়নি। নাট্যকার নিজেই তাদের খেয়ালী নিয়ন্তা হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। সমসাময়িক রাজনৈতিক চেতনাকে মূল্য দিতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহুবার স্ববিরোধিতাও করেছেন ব'লে মনে হয়। নাটকগুলির বিশেষ আলোচনায় আমরা তার বিস্তারিত পরিচয় দেব।

জ্যোতিরিন্দ্র-মানসের এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের স্ত্রী চরিত্রগুলির উপরেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। লক্ষণীয় যে, তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের প্রধান নারী-চরিত্রগুলিকে দু'টি স্বতন্ত্র পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম

১। শেষ বা ষষ্ঠ অঙ্কটি দ্রষ্টব্য।

যাঁরা মুখ্যত বীরাঙ্গনা—যেমন, 'পুরুবিক্রম' নাটকের ঐলবিলা, বা 'সরোজিনী' নাটকের সরোজিনী। এঁরা স্বদেশ বা স্বজাতি-প্রেমকে ব্যক্তিগত প্রেমের ওপরে স্থান দিয়েছিলেন। 'পুরুবিক্রম' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে যেখানে সংগ্রামের উদ্যোগ-মুহূর্তে পুরু ঐলবিলার হৃদয়ের কথা জানতে চেয়েছেন, চিত্তের সমস্ত প্রবণতা সত্ত্বেও ঐলবিলার সংযত কণ্ঠের প্রত্যুত্তরটি লক্ষণীয়।

—"যাক্ রাজকুমার। অগ্রে যুদ্ধে জয়লাভ করুন, এখন প্রেমালাপের সময় নয়।"

'সরোজিনী' নাটকের সরোজিনীও সঙ্কট মুহূর্তে প্রিয়তম বিজয় সিংহকে বর্জন করে স্বদেশ-হিতার্থে আত্মোৎসর্গের জন্য তৈরী হয়েছিলেন। কিন্তু; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শেষ দু'টি ঐতিহাসিক নাটকে আমরা ভিন্ন শ্রেণীর নারী-চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। 'অশ্রুমতী' এবং 'স্বপ্নময়ী' এই দুই নায়িকা নামাঙ্কিত নাটক দু'টিতে দু'টি নায়িকা-চরিত্রই একান্তভাবে ব্যক্তিপ্রেম-সর্বস্ব। স্বপ্নময়ীর প্রেমানুরাগকে নাট্যকার অবশ্য দেশানুরাগের ছদ্মবেশে উত্তীর্ণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, স্বপ্নময়ীর পিতৃদ্রোহিতা কতটা দেশানুরাগ সম্ভূত আর কতটাই বা প্রেমানুরাগ উদ্ভূত এ-সম্বন্ধে সংশয় থেকে যায়। আর অশ্রুমতীর ব্যক্তিগত প্রেমে ত কোন দ্বন্দ্বই নেই।

বীরাঙ্গনা ও প্রেমাঙ্গনা—এই দুই বিপ্রতীপ-চরিত্রের নায়িকা সমাবেশের দরুণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের নারী-চরিত্রের ব্যাখ্যায় সমালোচক-মহলে স্থির সিদ্ধান্তের অভাব লক্ষ্য করা যায়। অনেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তৎকালীন নারী-জাগৃতি আন্দোলনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের দৃষ্টান্ত তুলে ঐলবিলা বা সরোজিনীর সৃষ্টি-প্রেরণা নির্দেশ করেন। অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন ঃ

"যিনি নিজের পুরাঙ্গনাকে বীরাঙ্গনা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ঘোড়ার পিঠে পর্যন্ত চড়াইয়াছিলেন তিনিই ঐলবিলা ও সরোজিনীর ন্যায় স্ত্রী-চরিত্র সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"—বাংলা নাটকের ইতিহাস (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

কিন্তু এর বিরুদ্ধ-কোটির চরিত্র অশ্রুমতী বা স্বপ্নময়ীর সম্পর্কে এই বিচার প্রযোজ্য হ'তে পারে না। মুখ্যত এই শেষোক্ত শ্রেণীকে মনে রে'খে তিনিই অন্য এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন ঃ

"জেহেনা ব্যতীত অন্যান্য স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য নাই, সকলেই এক ধরনের—সরলা, পতি অথবা প্রেমিকের প্রতি একনিষ্ঠা ; এবং সহনশীলা।"

—ঐ, অজিতকুমার ঘোষ।

আমাদের মনে হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিধাগ্রস্ত মানসের মধ্যেই এই দুই

প্রান্তের চরিত্র-সৃজনের প্রেরণা নিহিত। নারী-জাগৃতি-আন্দোলন সেই যুগের জাতীয় আন্দোলনেরই একটি তরঙ্গ বিশেষ। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমন দেখেছি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্থির কোনো প্রত্যয়ে পৌঁছুতে পারেননি, তেমনি নারী-জাগৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও ঐ একই মানসের প্রকাশ। একথা ঠিক যে, ঠাকুর বাড়ীর পরিবেশ-পুষ্ট জ্যোতিরিন্দ্র-মানসে স্ত্রী-স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক।[১] এবং ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পাশাপাশি দু'টি আরব ঘোড়ায় জোড়া-সাঁকোর বাড়ী থেকে গড়ের মাঠ পর্যন্ত প্রায়ই বেড়াতে বেরুতেন, এ তথ্যও অস্বীকার করা যায় না। ঐলবিলা বা সরোজিনী এই আকাঙ্ক্ষারই প্রেরণাসম্ভূত হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য, অন্যান্য জাতীয় আন্দোলনের মতো নারী-জাগৃতির আন্দোলনও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিধাগ্রস্ত মনে নিঃসংশয় সমর্থন পায়নি। স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই রকম একটি প্রবন্ধে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন:

"সন্তানের লালন পালন ও সন্তানকে শিক্ষাদান এই দুইটি স্ত্রীলোকের প্রধান কার্য। যদি স্ত্রীলোকেরা গৃহকে পবিত্র রাখিতে পারেন—জ্ঞানধর্মের আলোকে আলোকিত করিতে পারেন—গৃহের মধ্যে সুখস্বচ্ছন্দতা স্থাপন করিতে পারেন—গৃহকে শ্রী-সৌন্দর্যে ভূষিত করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহাদের জীবনের কাজ করা হইল।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে সংস্কারমুক্ত নারী-জাগরণে অবাধ সমর্থন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছিল না। ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রী-নির্বাচনে সেই রকম স্ত্রীজাতির অধিকার সাব্যস্ত হওয়ায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এমন কি নৈতিক পতনেরও আশঙ্কা করেছিলেন।[২] তাই, তাঁর নাটকে শুধুই বীরাঙ্গনা নয়, কোনো কোনো নারী চরিত্রকে একান্তভাবে অন্তর্লোকবাসী রূপে চিত্রিত হতে দেখা যায়। তাঁর ঐলবিলা যেমন বহির্মুখী, অশ্রুমতী ঠিক ততটাই অন্তর্লীন।

এইবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষার কথা আলোচনা করা যেতে পারে। দীর্ঘায়তনই তাঁর নাটকের বৈশিষ্ট্য। আবার এই দীর্ঘায়ত নাটকের বৈশিষ্ট্য হ'ল সুদীর্ঘ সংলাপ, বিস্তারিত স্বগতোক্তি। বিজন স্বগতের চেয়ে জনান্তিক-উক্তিই (aside) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন বেশী। এটিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

১। প্রথম শিক্ষার প্রবর্তনকালে, "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রভৃতি) স্বীয় স্বীয় ভবনের বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন।"—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ: শিবনাথ শাস্ত্রী পৃঃ—১৭২।

২। স্ত্রী পুরুষভেদে অপরাধের ন্যূনাধিক্য—প্রবন্ধ মঞ্জরী: জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

ব্যক্তি-প্রতিভায় নির্দেশ না ক'রে, সেই যুগেরই নাট্য-বৈশিষ্ট্য ব'লে ধরা যেতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত যুগ-প্রসিদ্ধি সত্ত্বেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্য ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য অবশ্য-স্বীকার্য। ইতিপূর্বে আমরা Shakespeare-এর নাটকের অধ্যাপক Nicoll-কৃত আলোচনায় দেখেছি যে গভীরতর আবেদনের জন্য নাটকের ভাষায় কিছুটা ধ্বনি-সম্পদ প্রয়োজন। Shakespeare তাই তাঁর পরিণত Tragedy-গুলিতে Blank Verse ব্যবহার করেছেন। এও দেখেছি, অমিত্রাক্ষর এ দেশে সাধারণ্যে প্রচলিত না থাকায় মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীতে গান ব্যতীত পদ্য রচনা করেন নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ বিষয়ে মুখ্যত মধুসূদনের অনুগামী। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের অধিকাংশই গদ্যে রচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্বে বাঙলা নাটকে গদ্যের এমন সাবলীল ব্যবহার আর কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। প্রকাশ-ভঙ্গী কোথাও আড়ষ্ট নয়। এক কথায় তাঁর গদ্যে বঙ্গদর্শন-পরবর্তী লাবণ্যটুকু প্রস্ফুট। তাছাড়া চরিত্রানুযায়ী সংলাপে তিনি গদ্যের ঢঙ্ পরিবর্তিত করেছেন। প্রতাপ সিংহের[১] কথাবার্তায় যেমন দৃঢ় সংলাপের ঘোষণা, ভীল সর্দারের অশুদ্ধ উচ্চারণেও তেমনি তাঁর সংলাপ রীতির বিশুদ্ধি। সংলাপের এই যাথাযথ্যের জন্যই তাঁর নাটকে একাধিক গৌণ চরিত্র জীবনের স্বাক্ষরে উত্তীর্ণ।[২] চরিত্রোপ-যোগী সংলাপের অবশ্য পূর্ব-দৃষ্টান্ত রয়েছে, দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে। কিন্তু অভিজাত-শ্রেণী-চরিত্রের সংলাপে তিনি সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিন্তু উভয় স্তরেই দক্ষতার সঙ্গে বিচরণ করেছেন।[৩] জাতীয়তাবোধের বিশেষ উদ্দীপনা সঞ্চার করতে তিনি মাঝে মাঝে ছন্দোবদ্ধ সংলাপও ব্যবহার করেছেন। 'পুরুবিক্রম' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক সূচিত হয়েছে পুরুর উদ্দীপিত কাব্য-ভাষণে : "ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দান্ত যবনগণ, গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ" ইত্যাদি। এ-ছাড়া স্বপ্নময়ীতে নায়িকা তার মোহাচ্ছন্ন পূর্বরাগের অবস্থাও কবিতায় অভিব্যক্ত করেছে। দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক সূচিত হয়েছে স্বপ্নময়ীর দীর্ঘ স্বগত-উক্তিতে :

১। অশ্রুমতী নাটক।

২। এই প্রসঙ্গে 'সরোজিনী' নাটকের বাঙালী গ্রাম্য মুসলমান ফতে আলি স্মরণীয়। তার কথাবার্তার প্রাকৃতত্বই তাকে প্রকৃত চরিত্রে প্রমাণিত করেছে। একটু উদাহরণ, "কি মুস্কিলেই পড়লাম গা—(কম্পমান)। নসিবে যে আজ কি আছে বলতে পারি না। (চমকিত হইয়া) ও বাবারে! পায়ে কি ঠ্যাক্‌লো। এই অ'াদারে অ্যাহন কোয়ানে যাই;" ইত্যাদি। ১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

৩। অবশ্য অলঙ্কৃত সংলাপ যে একেবারেই নেই তা নয়। 'পুরু বিক্রমের' ৩য় অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্কে ঐলবিলাকে সম্বোধন ক'রে অম্বালিকা বলছে : "মহারাজ তক্ষশীল আপনার ন্যায় অমন সুকোমল পুষ্পকে কি প্রবল যুদ্ধ পবনের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন?" কিন্তু এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল।

"এই বেলা ফুল তুলি, হয়েছে সময়"—ইত্যাদি। কিন্তু, এখানে কবিতাই স্বাভাবিক ; কেননা স্বপ্নময়ীর সমগ্র সত্তাই কবিতায় নিমগ্ন। বস্তুত স্বপ্নময়ীর চরিত্র-কল্পনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের ভাবী নায়িকার পূর্বাভাস-ঘটেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। এখানে, তাই কবিতা শুধু যে সঙ্গত তাই নয়, অনিবার্যও।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই সব বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে এখন তাঁর নাটক-চারটির স্বতন্ত্র বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে—

'পুরুবিক্রম' (১৮৭৫) এইটিই তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। রচনাকাল ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ। কাহিনী খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর,—গ্রীকরাজ সেকেন্দর শার ভারত-আক্রমণ ও তাঁর সঙ্গে পাঞ্জাবের নরপতি পুরুরাজের স্বাধীনতা-সংগ্রাম। ইতিহাসের বাইরে কল্পিত চরিত্র-সৃষ্টির যে অধিকার নাট্যকারের আছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকটিতে তার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন। পুরু-ঐলবিলা কিংবা অম্বালিকা সেকেন্দর শার প্রেম কাহিনী ইতিহাসে নেই। কিন্তু মূল ইতিহাসের বোধকে অক্ষুণ্ণ রেখে নাট্যকারের কাহিনী বিস্তারের ক্ষমতা আছে। সুতরাং ঐসব কাহিনী বা চরিত্রের সৃষ্টির জন্য তাঁর নাটকের ঐতিহাসিক মূল্য কিছু কমেনি। বরং পুরু সম্বন্ধে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ধারণাটিকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণই রেখেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিন্তু অন্য একটি কারণে নাটকটির ঐতিহাসিক মূল্য অনেকটা কমে গেছে মনে হয় এটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের উচ্ছ্বসিত স্বদেশ বা স্বজাতিবোধ, হঠাৎ আসা বন্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যাকে উপমিত করেছেন। ঊনবিংশ শতকীয় এই স্বদেশবোধ নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রের মুখে এমন অনেক কথার সৃষ্টি করেছে যা হৃদিশ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ভারতবর্ষে মেলে না। এর প্রমাণে পূর্বে উদ্ধৃত উদাসিনী গায়িকার গানটি [১] ছাড়াও আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এই চরিত্রটির সামগ্রিক পরিকল্পনার পিছনে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত-ঐক্যের ধারণাই প্রত্যক্ষ কার্যকরী ছিল। বস্তুত, তাকে 'চরিত্র' না বলে এ যুগের জাতীয় ভাবের বিগ্রহ বলতে হয়। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে এরকম চরিত্রের বাস্তব সম্ভাবনা নাট্যকারও সংশয়িত ছিলেন বলে মনে হয়। তাই তার পরিচয় সম্বন্ধে তিনি কোন স্পষ্ট নির্দেশ দেন নি। উদাসিনী, তার জীবনাদর্শের কথা জানাতে গিয়ে বলেছে :

"আমি 'হোক ভারতের জয়' এই গানটি দেশ বিদেশে গেয়ে বেড়াই, এ

১। 'মিলে সব ভারত সন্তান,—১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক। আসলে এটি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত হিন্দুমেলার গান।

আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। যাতে সমস্ত ভারতভূমি ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হয়, এই আমার মনের একান্ত বাসনা।” তৃতীয় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

ভারত ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন, একথা খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর নয়, খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর। এক কথায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ইতিহাসবোধের প্রতি উদাসীনতাই এই ‘উদাসিনী’।

এ-ছাড়াও নাটকটির নায়ক-চরিত্র পুরুরাজের মধ্যে যে স্বদেশসেবীর আদর্শ চিত্রিত করা হয়েছে তা’ ইতিহাসানুগ না হ’য়ে নাট্যকারের যুগানুগ-ই হয়েছে বেশি। অবশ্য পুরুরাজের বীরত্ব ইতিহাস-স্বীকৃত। স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য তিনি আপ্রাণ যুঝেছিলেন এরও প্রমাণ আছে। কিন্তু এ কথা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না যে, বৃহত্তর ভারতীয়ত্বের উপলব্ধিই তাঁর এ সংগ্রামের প্রেরণা ছিল। নিজ ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীনতারক্ষার সীমিত দায়িত্বটুকুই তাঁর বিবেচ্য ছিল ব’লে মনে হয়। অথচ নাটকটিতে পুরুর আদর্শ অন্য এক ব্যাপকতর পটভূমিকায় উদ্দীপিত। তিনি “পঞ্চনদ-কুলবর্তী সমস্ত প্রদেশের রাজগণের”[১] প্রতিনিধি। শুধু তাই নয়, সেকেন্দর শাহের দূত এফেষ্টিয়নকে তিনি ‘দেশের প্রতিনিধি’ হিসাবেই যুদ্ধ-ঘোষণার কথা জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত রাজ্য রক্ষার জন্যেই নয়। এ-সমস্তই ইতিহাসের সত্যে যুগ-চৈতনার প্রক্ষিপ্ত আরোপ। ঐতিহাসিক নাট্য-সমালোচনার পরিভাষায় এদের বলা যেতে পারে কালাতিক্রম দোষ। পুরুরাজের বীরত্বও কতকটা অতিরঞ্জনের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। নাটকের উচ্চতর শিল্প-রুচি ছেড়ে এখানে লেখক লোকরঞ্জনী বৃত্তির আশ্রয় নিয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত, অভিনেতা হিসাবে তৎকালীন নাট্যামোদী দর্শকের রুচিবোধ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকায় এবং ঐতিহাসিক নাটক কৃষ্ণকুমারীর একটি আবেদন-মুখর চরিত্রে[২] প্রথম অভিনয়ের সঞ্চিত স্মৃতির সহায়তায় এ-বিষয়ে জনপ্রিয়তার চাবিকাঠিটি অনেক আগেই তাঁর হস্তগত। ‘বীররসের খতিয়ান’—বঙ্গদর্শনের এই সমালোচনা সত্ত্বেও সে-যুগের বাঙলা নাট্যমঞ্চে ‘পুরু-বিক্রমে’র আদর অবিসংবাদিত। তবু লক্ষ্য করা যায় যে, নাটকটিতে পুরু-রাজকে শুধু বীর হিসেবেই দেখানো হয়নি, তাঁর প্রেমিক সত্তাটিও স্বীকৃত। এমন কি তাঁর স্বদেশবোধের মূলেও ঐলবিলার প্রতি তাঁর

১। ২য় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক দ্রষ্টব্য।

২। কৈশোর থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অভিনয়ের দিকে প্রবল ঝোঁক ছিল। ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকে কৃষ্ণকুমারীর জননীর ভূমিকাতেই তিনি প্রথম অভিনয় করেন। দ্রষ্টব্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি: বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৯৮-১০০।

অনুরাগের উদ্দীপনার কথা বলা হয়েছে। একই চরিত্রের মধ্যে একাধিক চিত্তবৃত্তি অসম্ভব নয়, বরং তাই নাট্যোপযোগী। কিন্তু যেখানে নায়ক চরিত্রের মূল সুরটি আগন্তুক, কিংবা গৌণ কোনো উপলব্ধিতে বিপর্যস্ত সেখানে চরিত্রটির স্বাভাবিকতায় সংশয় জাগে। নাট্যকারের উদ্দেশ্যও ব্যাহত হয়। নাটকের শেষ দিকে পুরুরাজের চরিত্রেও এই ধরনের বিপর্যয় ঘটেছে ব'লে মনে হয়। স্বদেশবোধের উদ্দীপ্ত প্রাণনাতেই নাট্যকার পুরুরাজকে দর্শক বা পাঠকের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই তিনিই যখন একটি জালপত্রের সামান্য ক'টি ছত্রপাঠে ব্যর্থ-প্রণয়ীর নৈরাশ্যে ব'লে ওঠেন ঃ

"হা! কেন আমি বেঁচে উঠলেম? রণক্ষেত্রেই কেন আমার প্রাণ বহির্গত হ'ল না?"—পঞ্চম অঙ্কর ১ম গর্ভাঙ্ক।

—তখন সন্দেহ হয়, ঝিলমের তীরে সত্যিই বুঝি তাঁর মৃত্যু-শয্যা রচিত হয়ে গেছে। পুরু-চরিত্রের এই পরিবর্তন অস্বাভাবিক, এবং জ্যোতিরিন্দ্র-মানসে পূর্বোক্ত অস্থিতাবস্থাই দায়ী এ-জন্য। নাটকটির স্ত্রী-চরিত্রগুলির মধ্যে কুলু পর্বতের রাণী 'ঐলবিলা'র কথা আগেই বলা হয়েছে। চরিত্রটি স্বদেশ প্রেমে সুরু এবং পুরু-প্রেমে সমাপ্ত। অবশ্য নাটকটির সূচনাতেই পুরুর প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সে অনুরাগ এসেছে স্বদেশ প্রেমের পথ বেয়ে। তিনি স্পষ্টই স্বীকার করেছেন, বীরপুরুষ বলেই পুরু তাঁর কাছে বরণীয়। কিন্তু নাটকটির শেষ দিকে, পুরুর হীন সন্দেহ সত্বেও তিনি বিরহিণী নায়িকার মত চন্দ্র সূর্য সাক্ষী ক'রে কান্তের প্রত্যাশায় ধাবিত।[১] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রেমাস্পদদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি প্রিয় বিষয় (theme)। প্রায়ই দেখা যায়, এক পক্ষের সরলতা অন্য পক্ষের সংশয়ের দ্বারা, কিংবা উদ্দেশ্যমূলক প্রেমের নিপুণ অভিনয়ের দ্বারা কলুষিত। দ্বন্দ্বহীন মসৃণ প্রেমের চিত্র তিনি খুব কমই এঁকেছেন। তাই তাঁর একাধিক নাটকে ঐ একই বিষয়ের রচিতরচন দুর্লভ নয়। প্রেমাস্পদের অতি অমূলক সন্দেহ কী মর্মান্তিক পরিণতির সৃষ্টি করতে পারে তাই নিয়ে Shakespeare তাঁর বিখ্যাত 'Othello' নাটকটি লেখেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পক্ষে সেই Shakespeare-প্রভাবিত যুগে ঐ নাটকটির দ্বারা উদ্দীপিত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। 'পুরুবিক্রমে' অবশ্য ঐলবিলার উপসংহৃতি 'Desdemona'-র

১। পঞ্চম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্কে ঐলবিলার স্বগত স্মরণীয় "শশাঙ্ক? তুমি সাক্ষী; বল তোমার ন্যায় আমার হৃদয়ে কি কোন কলঙ্কের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ?"......ইত্যাদি।

ন্নত নয়, মিলনান্ত। কিন্তু 'অশ্রুমতীতে' সেলিমের সন্দেহ অস্ত্র-প্রয়োগের আগে প্রশমিত হয়নি। 'অশ্রুমতী' নাটক প্রসঙ্গে বিষয়টি আমরা বিস্তারিত বিশ্লেষের চেষ্টা করব।

'পুরুবিক্রমে'র অন্য প্রধান স্ত্রী-চরিত্র অম্বালিকা। এটিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেণী-চরিত্রের (Type character) পর্যায়ভুক্ত। তাঁর প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক নাটকে দেখা যায়, প্রণয়ী ও প্রণয়িণী জাতি-ধর্মের দিক থেকে বিভিন্ন। এই বিজাতীয় প্রেমের গভীর এবং অগভীর উভয় দিকের চিত্রই তিনি নিয়েছেন। গভীর বিজাতীয় প্রেমের দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রথমেই অম্বালিকা-সেকেন্দর শা'র কাহিনী উল্লেখ করতে হয়। 'অশ্রুমতীতে' সেলিম-অশ্রুমতীর প্রসঙ্গও এই পর্যায়ে স্মরণীয় যদিও সেলিমের প্রেমে তেমন কোনও গভীর আত্মনিবেদন ছিল না (বা নাট্যকার থাকতে দেন নি)। 'সরোজিনীতে' রোষেণারার প্রেমও গভীর। কিন্তু প্রতিবেদনের অভাবে অচরিতার্থ। অগভীর বিজাতীয় প্রেমের চিত্র পাওয়া যায় 'স্বপ্নময়ী' নাটকে, জেহেনা ও জগৎরায়ের পারস্পরিক সম্পর্কে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, অগভীর বিজাতীয় প্রেম সম্পর্কে নাট্যকারের অভিমত অদ্ব্যর্থ উচ্চারিত হ'লেও[1] গভীর বিজাতীয় প্রেম সম্পর্কে তাঁর পূর্বোক্ত দ্বিধাগ্রস্ত মানসের অস্পষ্ট সিদ্ধান্তই পুনরাবর্তিত। কখনও দেখা যায়, মানবিকতা বোধ থেকে তিনি একে সমর্থন করেছেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই নৈতিক সংস্কারের চেতনায় তাঁর সহানুভূতি প্রত্যাহৃত। যদি পরিণতি দেখেই এ সম্বন্ধে লেখকের মত যাচাই করতে হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে, নৈতিক সংস্কারই শেষাবধি জয়ী হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্র-মানসে। গভীরতা সত্ত্বেও বিজাতীয় প্রেমের একটি চিত্রও তাঁর হাতে মিলনান্ত পরিণতি লাভ করেনি। পুরুবিক্রম নাটকের শেষদৃশ্যে অম্বালিকাকে তাই, "আলুলায়িত কেশে সন্ন্যাসিনী বেশে"[2] উপস্থাপিত করতে হয়েছে। অবশ্য অম্বালিকার এই "সন্ন্যাস শাস্তিকে"[3] নাট্যকার একটি কবিজনসুলভ ন্যায়ের প্রেরণায় (Poetic justic) উত্তীর্ণ করতে চেয়েছেন। অম্বালিকারই ষড়যন্ত্রে পুরু এবং ঐলবিলার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘনিয়ে উঠেছিল। সেকেন্দর শা তাকে ত্যাগ ক'রে গেলে সে নিজেই বলেছে ঃ

১। জগৎ রায়ের হৃত-সর্ব্বস্ব পরিণাম স্মরণীয়।

২। শেষ অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্কে অম্বালিকার বর্ণনা স্মরণীয়।

৩। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাঁর স্বভাব-শাণিত উক্তিতে একবার বলেছিলেন যে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সন্ন্যাসরোগ' ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথেও এ-প্রভাব সংক্রমিত হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়।

"আমি যেমন দুইটি প্রেমিকের সুকোমল প্রেমবন্ধন ছিন্ন ক'রে দিয়েছি, বিধাতাও তেমনি আমার হৃদয়ের প্রেমকুসুম শুষ্ক ক'রে আমার পাপের উচিত প্রতিফল দিলেন।"—পঞ্চম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

কিন্তু, এ শাস্তি যে লঘু পাপে গুরুদণ্ড সন্দেহ নেই। বস্তুত, স্বদেশবোধের সাময়িকতার সঙ্গে প্রেমবোধের চিরন্তনতার কোনও মৌলযোগ আছে কি-না এবিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্র-মানসের অবচেতনে যথেষ্ট দ্বন্দ্ব ছিল। এই দ্বন্দ্বের পূর্ণতর বিকাশ পরবর্তীকালের রচনা 'অশ্রুমতী' নাটকের সেলিম্-অশ্রুমতীর প্রসঙ্গে। যথাস্থানে আমরা এ আলোচনা উত্থাপন করব। এখানে শুধু এইটুকুই লক্ষণীয় যে, অম্বালিকার চরিত্র-চিত্রণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উক্ত মনোবৃত্তির ঈষৎ আভাস দুর্লভ নয়। আকস্মিক বিচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত অম্বালিকা চরিত্রের প্রেমোদ্দীপ্ত প্রকাশ অক্ষুণ্ণ। দেশবাসীর অভিশাপ-কুড়ানিয়া এই মেয়েটিকে নাট্যকার তার স্বভাব বিরুদ্ধ একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করতেও ছাড়েন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন সে তার প্রেম সম্পর্কে বলে :

"বিজয়ী শেকন্দর শাকে আমার প্রণয়ী বলে স্বীকার করতে আমি কিছুমাত্র লজ্জিত নই।"—তৃতীয় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

—সেই দ্বিধাহীন নিষ্কম্প্র আত্মপ্রত্যয় তার প্রেমের মহিমাকেই প্রমাণ করে। একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, অম্বালিকাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম মহিলা চরিত্র, যাকে সমসাময়িক দেশাত্মবোধের যূপকাষ্ঠে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে এই শ্রেণীর হতভাগ্য চরিত্র একাধিক। নাটকের ক্রম-অনুযায়ী তাদের কথা বিবৃত হবে। এবার পরবর্তী ঐতিহাসিক নাটক 'সরোজিনী'র আলোচনায় আসা যেতে পারে।

সরোজিনী : (১৮৭৫)—প্রাচীনযুগের ইতিহাস ছেড়ে এবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মধ্যযুগের ইতিহাস ধরলেন। এ-অধ্যায়ের ভূমিকায় এ-যুগের জাতীয়তাবোধের হিন্দুপ্রবণতার কথা বলেছি। হিন্দু-ঘেঁষা জাতীয়তাবোধের স্ফুরণে মধ্যযুগের মুসলমান আমলের ইতিহাসই প্রশস্ত। তা'ছাড়া এ সময়ের হিন্দু জাতির মধ্যে পারস্পরিক অনৈক্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেও পীড়া দিয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন :

"সমস্ত হিন্দুজাতির মধ্যে এখন একতা নাই—এখন হিন্দুজাতিকে একটি সমগ্র জাতি বলিয়াই যেন বোধ হয় না।...এই একতার অভাবেই আমরা স্বাধীনতা হারাইয়াছি, এবং পৃথিবীর অনেক জাতিই এই একতার অভাবেই স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে"—'ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা' : প্রবন্ধমঞ্জরী,—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

মধ্যযুগে মুসলমান আমলে হিন্দু শৌর্যের কাহিনী তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে সাদরে গৃহীত হ'ল। তাঁর মুখ্য অবলম্বন হ'ল টড্-প্রণীত রাজস্থান। এরই একটি কাহিনী নিয়ে তিনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'সরোজিনী' রচনা করেন।

নাটকটিতে হিন্দু-ঘেঁষা জাতীয়তার প্রভাব সুস্পষ্ট। এই বোধ থেকেই নাটকটিতে রাজপুত জাতির আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মাচরণের কুসংস্কার এবং আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের কথা সখেদে বর্ণিত হয়েছে। চিতোরের দুর্গদ্বারে আল্লাউদ্দীন (আলাউদ্দীন) দ্বিতীয়বার সসৈন্য উপস্থিত, সেই সঙ্কট মুহূর্তেও কীভাবে মেবারের রাজা মন্দিরের দ্বারে কল্পিত দৈব-প্রত্যাশায় মগ্ন লেখক তার বিস্তৃত চিত্র দিয়েছেন। নাটকটিতে ঐতিহাসিক তথ্য সর্বথা অনুসৃত না হ'লেও মোটামুটিভাবে ইতিহাসের বোধ অক্ষুণ্ণ থেকেছে[১]। রাজপুত জাতির গৃহযুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার কথা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু এক স্বজাতিবোধে সংহত হয়ে লুপ্ত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা নাট্যকারের যুগের বার্তাই বহন করে। এই নাটকটির বিজয়সিংহ চরিত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যুগের কথা প্রায়ই ধ্বনিত। উদাহরণ হিসাবে, বিজয় সিংহের একটি দীর্ঘ উক্তির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হতে পারে:

"মহারাজ! সর্বদাই দৈবের মুখাপেক্ষা করে থাকলে মনুষ্য দ্বারা কোন মহৎ কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। আমাদের কার্য্য ত আমরা করি, তারপর যা হবার তা হবে। ···যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কার্য্য কত্তে বলচেন, তখন তাই যথেষ্ট, আর কোনোদিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন নাই। মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী।"—প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মাতৃভূমির বাক্যই আমাদেরদৈববাণী—এটি উনবিংশ শতকের যুগবাণীও।

জাতীয় চরিত্রের ধর্মকাতর দুর্বলতার কথা বলতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাহিনীতে যে জটিলতার সৃষ্টি করেছেন তার নাট্যমূল্য অনস্বীকার্য। ঐতিহাসিক নাটকের ভূমিকার আলোচনায় আমরা দেখে এসেছি দ্বন্দ্ব-ই (conflict) আধুনিক নাটকের প্রাণ। ঐতিহাসিক নাটকে এই দ্বন্দ্বের অবকাশ যে স্বল্প তা-ও আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু ঐতিহাসিক হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান নাটকটিতে অন্তর্দ্বন্দ্বের চমৎকার ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরে দৈববাণীর ব্যাখ্যায় ছদ্মবেশী ভৈরবাচার্য্য (মহম্মদ আলি) যখন রাণা লক্ষ্মণ সিংহকে জানালো যে, কন্যা

১। টড্—দ্রষ্টব্য।

সরোজিনীর রক্তেই রাজপুত জাতির বিজয়লক্ষ্মী প্রসন্ন হবেন, সেই মুহূর্ত থেকেই রাণার চরিত্রে সন্তান-বাৎসল্য ও দেশপ্রেমের সংঘাত সুরু হ'ল। অবশ্য 'কৃষ্ণ-কুমারী'র ভীমসিংহে পূর্ব দৃষ্টান্ত থাকায় এই দ্বন্দ্বের মৌলিকতায় সন্দেহ করেছেন কেউ কেউ। আমাদের মনে হয়, 'কৃষ্ণকুমারী'তে এই দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও মধুসূদন তার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করেন নি। কন্যা-হত্যার সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে পিতা সেখানে উন্মাদ, সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের বহির্লোকে নিক্ষিপ্ত। কিন্তু 'সরোজিনী' নাটকে পিতার স্নেহ ও রাজার কর্তব্যবোধের সংগ্রামে লক্ষ্মণসিংহের চিত্ত শেষাবধি ক্ষত-বিক্ষত।

এই কাহিনীর নাটকীয়ত্বের আর একটি দিক্ ছদ্মবেশী ভৈরবাচার্য্য চরিত্রের আশ্চর্য উপসংহৃতি। তারই নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে এক প্রতারিত পিতা তার নিরপরাধ কন্যা-হননে উদ্যত হয়েছিল। শুধু যে সে-ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হ'ল তা-ই নয়, সেই ষড়যন্ত্রেরই সূত্র বেয়ে তার নিরপরাধ কন্যার মাথায় মৃত্যুদণ্ড নেমে এল—তারই নিজের হাত দিয়ে। হত্যাকাণ্ডের পর মহম্মদ আলির সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও রোষেনারার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারে। বীভৎস হলেও ঘটনাটিতে যে নাটকীয় শ্লেষের (Dramatic Irony) সৃষ্টি হয় তার বিন্যাস কৌশল প্রশংসনীয়।

আগেই দেখেছি, ভারতের জাতীয় আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমানের স্থান সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানসে একটি সংশয়ের ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল। তাঁর জাতীয় ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটকে তাই মুসলমান চরিত্রের স্থান একান্তই অনিশ্চিত। তবে তাঁর 'সরোজিনী'তে অন্তত একটিও অকলঙ্কিত মুসলমান চরিত্র নেই। নাটকটির কুটিল ষড়যন্ত্রকারী 'ভিলেন'—মহম্মদ আলি। তার নিরীহ গ্রাম্য অনুচর ফতে উল্লাও ঘোর সাম্প্রদায়িক। সে বলে :

"মোরা বাদশার জাৎ,…মুই বাদ্‌শা হ'লি ত আগে এই হ্যাঁদু ব্যাটাদের কুটি কুটি করে জবাই করি"…ইত্যাদি। তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বলাবাহুল্য, পরিহাস ছলে লেখক এখানে সাধারণ মুসলমানের উগ্র সম্প্রদায়-বোধের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। রোষেনারা তার প্রেমের সহায়ক হবে না জেনেও, সরোজিনীর হত্যা আয়োজনকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। এমন কি, পরাক্রান্ত বাদ্‌শা আলাউদ্দীনও অব্যাহতি পান্‌নি। তাঁর ওম্‌রাহগণের কথাবার্তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এই যে, তিনি স্বভাবতই বিলাসমত্ত, কেবল উজিরের সংস্পর্শে এসেই তাঁর যুদ্ধোন্মাদনা জেগে ওঠে, এবং সে যুদ্ধোন্মাদনারও মুখ্য উদ্দেশ্য হিন্দুরমণীর সতীত্ব নাশ।

"এবার দেখব, পদ্মিনী-বেগম কেমন তার সতীত্ব রক্ষা করতে পারে" ? দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পদ্মিনী-লিপ্সা সত্ত্বেও আলাউদ্দীনের মুখে এ উক্তি চরিত্র-সঙ্গত নয়।

ঊনবিংশ শতকের জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের এক ধরনের সঙ্গীতে। একে স্বদেশী সঙ্গীত বলা যেতে পারে। পুরু-বিক্রমে আমরা সত্যেন্দ্রঠাকুর বিরচিত 'গাও ভারতের জয়'—গানটির দৃষ্টান্ত দেখেছি। 'সরোজিনী'তেও রবীন্দ্র-বিরচিত 'জ্বল্ জ্বল্‌চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ'—গানটি এককালে সারা বাঙলা দেশে জ্বলে উঠেছিল। এই ধরনের গান এই শ্রেণীর নাটকে নিছক বিরতির (relief) উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয় না। এগুলি নাটকের প্রাণের তাগিদেই সম্ভূত। 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা'—গানটির আংশিক আলোচনা আগেই করা হয়েছে। পুনরুক্তি না ক'রে এখানে এইটুকুই শুধু উল্লেখ করব, যে, আত্মদহনের ভস্মাবশেষই এই গানটির প্রতিপাদ্য নয়, সেই দহনের মধ্যেও অনাগত সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ-বাণী :

"শোন্ রে যবন, শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী রলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥"

এই আকাঙ্খার অন্তিম পরিচয় ধ্বনিত হয়েছে শেষ দৃশ্যে, ভৃত্য রামদাসের কণ্ঠে :

"স্বাধীনতা-রত্নহারা, অসহায়া, অভাগা জননি।
ধনমান যত পর হস্ত-গত
পরশিরে শোভে তব মুকুটের মণি।
নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, কোষবদ্ধ নিস্তেজ-কৃপাণ ;
শর তূণাশ্রিত রণবাদ্য হ'ত।
ধূলায় লুটায় এবে বিজয় নিশান।
দেখিব নয়নে কিগো আর সেই সুখের তপন,
ভারতের দগ্ধভালে উদিত হইবে কালে,
বিতরিয়া মধুময় জীবন্ত কিরণ ?"

অশ্রুমতী (১৮৭৯) :—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলির মধ্যে যেটি সমসাময়িক সমালোচনায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছিল, তা এই 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯)।

জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সেই যুগের ঐতিহাসিক নাটকের সম্পর্ক কী প্রত্যক্ষ ছিল, অশ্রুমতী নাটকটি তার জোরালো প্রমাণ। টড্ থেকে কাহিনী গ্রহণ করলেও,[১] তাঁর অন্যান্য নাটকের মত এখানেও তিনি একাধিক ঘটনা বা চরিত্র কল্পনা করে নিয়েছেন। এই রকম একটি কাল্পনিক চরিত্র প্রতাপসিংহের কন্যা অশ্রুমতী, এবং কাল্পনিক ঘটনা, সেলিমের প্রতি তার অনুরাগ। সে যুগের হিন্দু-ঘেষা জাতীয়তাবাদীরা বিষয়টিকে খুব প্রীতির চোখে দেখেননি। বস্তুত, নাটকটি লেখার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে পত্রাঘাত করেছেন অনেকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর কিছু কিছু উত্তরও দেন। সেই উত্তর প্রত্যুত্তর যাই হোক্ না কেন, তার অন্তর্নিহিত সত্যটুকু দিবালোকের মত স্পষ্ট। তা হ'ল, সেই যুগের ঐতিহাসিক নাটকের সঙ্গে সমসাময়িক জাতীয় আন্দোলনের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা।

সমসাময়িক জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিধাগ্রস্ত মানসের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এ নাটকে তার পরিচয় পুনরভিব্যক্ত। মনে হয়, 'অশ্রুমতী'র সময় থেকেই জ্যোতিরিন্দ্র-মানসে 'স্বদেশবোধের বন্যা' ক্ষীণ হয়ে আসে। অবশ্য 'অশ্রুমতী' নাটকে স্বদেশবোধাত্মক অনুচ্ছেদের অংশ দুর্লভ নয়। প্রতাপসিংহ চরিত্রের মৌল রেখাঙ্কনও ঐ বোধজাত। প্রতাপসিংহের স্বাধীনতা-রক্ষার দুর্জয় সঙ্কল্পে স্বদেশী আন্দোলনের অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহাই উচ্চারিত। আর দেশহিতব্রতে তাঁর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার প্রতিজ্ঞা পরবর্তী স্বদেশী আন্দোলনের বিলাতী দ্রব্য-বর্জনের পূর্বাভাস বলেই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তিটি উদ্ধৃতি-যোগ্য :

"...যতদিন না চিতোরের অস্তমান গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে পারি—ততদিন আমরা ও আমাদের উত্তরাধিকারিগণ একটিও বিলাসসামগ্রী ব্যবহার করব না"... ইত্যাদি। প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

এই প্রসঙ্গে পরবর্তী যুগের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই'—বিখ্যাত স্বদেশী গানটি মনে পড়ে।

কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও নাটকটিতে স্বদেশবোধের প্রকাশ অকুণ্ঠ নয়। তার বড়

১। প্রতাপসিংহের বীরত্ব-ই নাটকটির ঐতিহাসিক অংশ। নাটকটির নামাঙ্কের নীচেই টড্-এর রাজস্থান থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে—"There is not a pass in the Alpine Aravalli that is not sanctified by some deed of Pertap,—some brilliant victory, as oftener, more glorious defeat. Huldighat is the Thermopylae of Mewar ; the field of Deweir her Marathon."

প্রমাণ, নাটকটির কল্পিত প্রেমোপাখ্যানের অংশটির প্রতি নাট্যকারের পক্ষপাতিত্ব। স্পষ্টই বোঝা যায়, প্রতাপসিংহের (তাই স্বদেশবোধের) প্রতি নাট্যকার অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারেন নি বা চান নি। অশ্রুমতী-সেলিমের প্রেম-কাহিনীই তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছিল বেশি। এ কথাও ঠিক যে, এই প্রেমকে তিনি স্বদেশবোধের সংস্কারমুক্ত মন নিয়েই চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন। 'অশ্রুমতী'র বিজাতীয় প্রেম নিয়ে যখন তৎকালীন হিন্দুসমাজে তুমুল বিক্ষোভ ঘুলিয়ে উঠেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন জাতীয়তাবোধ-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ শিল্পমূল্যেই চরিত্রটির পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। তিনি একটি পত্রে জানান:

"যদি কেহ বলেন, প্রতাপসিংহের দুহিতা একজন মুসলমানকে ভালবাসিবে—দেখুন কিরূপ অবস্থায় অশ্রুমতী মানুষ হইয়াছিল—সে জানিত না রাজপুত কে মুসলমান কে। যে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল তাকেই সে ভালবাসিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?"—কেশবপ্রসাদ মিশ্র (Hony Sec. to the Barabary Library)—কে লিখিত।

এমন কি রাজপুত-মুসলমানের জাতি-পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পরও প্রেমের জাতি নিরপেক্ষ শাশ্বত মূল্যের কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়েছেন অশ্রুমতীর একটি উক্তিতে। পিতৃব্য শক্তসিংহের সেলিম সম্বন্ধে সতর্কীকরণের পর অশ্রুমতীর সার্থক উক্তিটি স্মরণীয়।

"আমি রাজপুতও জানিনে, মুসলমানও জানিনে—আমার হৃদয় যাকে চায়, আমি তাকেই জানি।"

অবশ্য সমসাময়িক যুগ-তাড়নায় চরিত্রটির শেষ রক্ষা করতে পারেন নি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। উপসংহারে তাকে যোগিনীত্বে নির্বাসিত করেছিলেন। তা' সত্ত্বেও, চরিত্রটির এই সম্ভাবনার স্বীকৃতিই এই যুগের হিন্দু-ঘেঁষা উগ্র জাতীয়তাবোধের সুস্থতা সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্র-মানসের কুণ্ঠিত সংশয়ের পরিচয় বহন করে না কি?

তা'ছাড়া, অশ্রুমতীর প্রণয় প্রসঙ্গ সরিয়ে রে'খে নিছক প্রতাপসিংহের কেন্দ্রীয় কাহিনীর বিশ্লেষণ করলেও স্বদেশবোধ সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ক্রম বিবর্তিত মানসের পরিচয় মিলবে। প্রতাপসিংহের স্বাধীনতা-যুদ্ধকে তিনি আর পুরুরাজের মত এক সর্বভারতীয় পটভূমিকায় উত্তীর্ণ করতে চাননি। বরং রাজপুত জাতির ইতিহাসের যথাযথ অনুগমনে তাঁর ব্যক্তিগত শৌর্য এবং বংশ-গৌরবের প্রেরণার

কথাই বলেছেন। "বাপ্পারাওর বীররক্ত এবং সর্বলোক পূজনীয় রামচন্দ্রের 'অকলঙ্কিত' রক্তের উত্তরাধিকারের" ঘোষণায় বারবার প্রতাপসিংহের বংশ-গৌরবের দিক্‌টাই বড় হ'য়ে ফুটেছে। এ গৌরব মাঝে মাঝে ব্যাপ্তি পেয়ে তীব্র হিন্দু জাতীয় গৌরবেও পরিণত হয়েছে। ফলে, 'ঘৃণ্য মুসলমান', 'পামর যবন' ইত্যাদি উক্তি অবিরল। রাজপুত কবি পৃথ্বিরাজেরও দেশোদ্দীপনা একান্তভাবে হিন্দু গৌরবের। তার সূচনাই হল :

"হিন্দুর ভরসা আশা হিন্দুর উপর"—তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অশ্রুমতী-সেলিম প্রসঙ্গে অধিকতর আকৃষ্ট নাট্যকার ঐ উপকাহিনীটিকে একটি সার্থকতর নাট্যরূপ দিতে প্রয়াস পান। এই বিষয়ে তিনি Shakespeare-এর Othello-নাটকের আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন বলে মনে হয়। Desdemona-র মত অশ্রুমতীও পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন ভিন্ন জাতীয় পুরুষকে হৃদয় দান করেছেন। দু'জনেই একান্ত সরল। Othello নাটকের Iago-র মত ফরিদ-ও ভিলেন চরিত্র। সেলিমের মনে সন্দেহ জাগাতে সেও প্রায় Iago-র পদ্ধতিরই হুবহু অনুসরণ করেছে। Othelloর মর্মান্তিক Tragedy সৃষ্টি করতে কথা ছাড় Iago ব্যবহার করেছিলেন একটি ছোট্ট রুমাল। ফরিদ সাহায্য নিয়েছে এব টুক্‌রো পত্রের। Iago-র চরিত্র বিশ্লেষণে যেমন Coleridge বলেছেন :

"Motive-hunting of a motiveless malagnity" ফরিদ সম্বন্ধেও শে পর্যন্ত ঐ কথাই বল্‌তে হয়। সে নিজেই স্বীকার করেছে :

"যদি বা (অশ্রুমতী) নিতান্তই মারা পড়ে, তাতে বা কি ?—আমাকে যেমন সে দুই চোখে দেখতে পারে না—তারই এই সমুচিত প্রতিশোধ হবে—আমার কি এল গেল"—ইত্যাদি। চতুর্থ অঙ্ক, চতুর্দ্দশ গর্ভাঙ্ক ফরিদের স্বগত দ্রষ্টব্য ভালবাসা ও সংশয়ের বিক্ষত অন্তর্দ্বন্দ্বে Othello-র সঙ্গে সেলিমের এমন কি ভাষাগত মিলও দুর্লভ নয়। তীব্রতম সংশয়ের মুহূর্তেও সেলিম বলেছে :

"আহা !......ঐ সরল মুখচ্ছবিতে ছলনার কি একটু আভাসও পাওয়া যায়"—চতুর্থাঙ্ক, দশম গর্ভাঙ্ক।

Othello-ও তাঁর যন্ত্রণার তীব্র মুহূর্তে বলেছে :

"Look ! where she comes
If she be false, Oh ! then heaven mocks itself"—(Act III Scene III)

হত্যাদৃশ্যে সেলিমের উক্তি ঃ—

"আর যেই নিদ্রিত হোক্‌……পাপের চোখে নিদ্রা নাই।"—চতুর্থাঙ্ক, ষোড়শ গর্ভাঙ্ক। —Othello নাটকে Iago-র সেই বিখ্যাত উক্তিটিকে মনে পড়ায় ঃ

"Not poppy, nor mandragora,
Shall ever medicine thee to that sweet sleep
Which thou ow'dst yesterday." (Act III, Scene III).

নাটকটিতে স্বদেশপ্রেমের দু'একটি গান থাকলেও তারা পূর্ববর্তী "গাও ভারতের জয়" বা "জল্‌জল্‌ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ",—প্রভৃতি সঙ্গীতের উদ্দীপনা-বিরহিত। বস্তুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে পরিবর্তিত মানসের কথা বলেছি তার পরিচয় নাটকটির গানগুলি থেকেও জ্ঞাতব্য। লক্ষণীয় যে, এই নাটকটিতে তিনি প্রেম সঙ্গীতের প্রতি বেশী মনোযোগী। স্বরচিত প্রেম সঙ্গীত ছাড়াও এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত "গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে" সঙ্গীতটিও ব্যবহার করেছেন। অতএব দেখা গেল, চরিত্র ঘটনা বা সঙ্গীতে 'অশ্রুমতী' নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বদেশ-নিরপেক্ষ বহুভাবের অবতারণা করেছেন। তাই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, 'অশ্রুমতী' নাটক জ্যোতিরিন্দ্র-মানসের একটি স্পষ্ট দিক্‌-পরিবর্তন।

স্বপ্নময়ী (১৮৮২) ঃ 'অশ্রুমতী' নাটকে জ্যোতিরিন্দ্র-মানসের যে দিক্‌-পরিবর্তনের কথা বলা হ'ল, তিন বৎসর পরে রচিত 'স্বপ্নময়ী'তে তারই কালানুগ পরিণতি। জ্যোতিরিন্দ্র-মানসের পূর্বোক্ত অবস্থা—একদিকে সমসাময়িক জাতীয়তাবোধের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত আত্মসমর্পণের ইচ্ছা অন্যদিকে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধ-নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম মানবিক অনুভূতির প্রতি ক্রমবিস্তৃত আগ্রহ—নাটকটিতে স্পষ্ট প্রতিভাত। 'স্বপ্নময়ী'তে সমসাময়িক জাতীয়তাবোধের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। পূর্বোক্ত হিন্দু জাতীয়তাবোধের অনুস্মৃতিও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। যেমন তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কে স্বপ্নময়ীর যবন নিন্দাত্মক কাব্যোচ্ছ্বাস স্মরণীয়। সেখানে দেব-মন্দিরে ম্লেচ্ছ পদাঘাত, গো-হত্যা ইত্যাদির ঘৃণিত উল্লেখ আছে। কিন্তু, পূর্বের তুলনায় বিরল। এমন কি স্বদেশবোধও, উগ্রতা পরিহার করে শান্তরূপ ধারণ করেছে। প্রথমে সেই দিক্‌টাই আমরা আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হ'ব।

নাটকটিতে বর্ধমানের তালুকদার শুভ-সিংয়ের স্বদেশবোধাত্মক বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এটি ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধারণা। ইতিহাস বলে ঃ "Shovā singh, a Zamindār of Cheto-Bardā in the Ghātāl—Chandrakona a Subdivision of Midnapur, took to plundering his neighbours,

about the middle of 1695. Raja Krishna Rām, Panjabi Khatri, who held the contract for revenue collection of the Burdwan District, opposed the brigand with a small force, but was defeated and slain (January 1696). His wife and daughters were captured by Shovā Singh, who took the town of Burdwan itself with all the Rajah's property. With the vast wealth thus gained the rebel leader greatly increased his army, took the title of Raja, and began to plunder and occupy the neighbouring country. Rahim Khan the leader of the Orissa Afghans, joined him and greatly increased his military strength......At Burdwan in making an attempt upon the honour of Raja Krishna Ram's daughter, Shovā Singh was stabbed to death by that heroic girl, who next plunged the dagger, into her own heart."—Jadu Nath Sarkar. History of Bengal.—Vol. II, Chapter XX, pp. 393-4.

বলা বাহুল্য, কি শোভাসিং কি স্বপ্নময়ী কা'রও চরিত্রাঙ্কনে ইতিহাসের যথাযথতা রক্ষিত হয় নি। এমন কি ইতিহাসের মূল সত্যকেও বিপর্যস্ত ক'রে সমসাময়িক জাতীয়তাবোধের আরোপ করা হয়েছে শোভাসিং চরিত্রে। বর্দ্ধমান রাজকন্যাকে নাট্যকার করেছেন শোভাসিংহের আদর্শে আকৃষ্ট অনুরাগিণী। এমন কি নাটকটির সূচনাতেই স্বদেশবোধ সম্বন্ধে শুভ সিংহের চিত্তে যে দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে তা একান্ত ভাবেই এ যুগের। ইতিপূর্বে আমরা দেখে এসেছি, উদ্ভবযুগে ভারতের জাতীয়তাবোধ 'Machiavelli-র য়ুরোপীয় ন্যাশন্যালিজমের আদর্শ দ্বারাই প্রভাবিত (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সেই আদর্শের মূল কথাই হ'ল, সাধন পদ্ধতি ভাল বা মন্দ যাই হোক্ না কেন লক্ষ্যের বা সাধ্যের মহত্ত্ব দ্বারাই তা গ্রহণীয় (end justifies the means)। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, নির্দিষ্ট ক'রে বলতে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকেই, ভারতের জাতীয়তাবোধ তার নিজস্ব আদর্শ খুঁজে নিতে সচেষ্ট। বলা বাহুল্য, এই লক্ষ্য-সর্বস্ব য়ুরোপীয় জাতীয়তা বঙ্কিমচন্দ্রে স্বীকৃত হয়নি।[১] জাতীয়তাবাদের এই উগ্র য়ুরোপীয় আদর্শের বিষয় বাঙালীর চিত্তে যে অন্তর প্রশ্নের উদয় হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী'র নায়কের অন্তর্দ্বন্দ্বে তারই নির্ভুল প্রতিধ্বনি। আর, শুভ সিংহের অনুচর সুরজমল হচ্ছে উদ্ভব

১। তাঁর ধর্মতত্ত্বের 'স্বদেশপ্রীতি' প্রবন্ধটি স্মরণীয়।

যুগের ভারতীয় উগ্র জাতীয়তাবাদীর প্রতিনিধি। 'স্বপ্নময়ী' নাটকের সুরুই হয়েছে এই দুই বিরোধী ভাবাদর্শের সংঘাতের মধ্য দিয়ে। শুভ সিংহ বলেছেন :

"আমি দেশের জন্য মাতৃভূমির জন্য ধর্মের জন্য আর সকল ক্লেশ সকল যন্ত্রণাকেই আলিঙ্গন কচ্ছি ; কিন্তু দেবতার ভাণ করে লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা—ছদ্মবেশ ক'রে লোকদের প্রতারণা করা—ওঃ কি জঘন্য কি জঘন্য।"

আর তার উত্তরে সুরজমলের বক্তব্য :

"সে কথা সত্যি—প্রতারণাটা যে বড় ভাল কাজ, তা আমি বল্‌চিনে—কিন্তু এ ভিন্ন যখন আর কোন উপায় নেই, তখন কি করবেন বলুন—মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কখন কখন হীন উপায়ও অবলম্বন করতে হয়।"

শেষ কথাটি 'end justifies the means'-এর অবিকল প্রতিধ্বনি। শুভসিংহের চরিত্রে অবশ্য স্বদেশবোধের উগ্র তাড়নাই আপাত-জয়ী হয়েছে। দেবতার ছদ্মবেশে সাধারণে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর নিভৃত মুহূর্তের আত্ম-বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, এ সম্বন্ধে বরাবরই একটি প্রতিবাদ ছিল তাঁর মনে। স্বপ্নময়ীর সংস্পর্শে আসার পর এই প্রতিবাদ তীব্র আত্মধিক্কারে পরিণত হয়। তাই চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে তাঁকে বলতে শুনি :

"আত্মার যদি বল গেল তো কিসের বলে যুদ্ধ করব—অন্যায়ের বিরুদ্ধে অধর্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে শেষে কিনা নিজেই আমি অধর্ম আচরণ করচি ?"

উপসংহৃতিতেও দেখি দেশাত্মবোধের ওপর ধর্মবোধেরই জয় হয়েছে। স্বপ্নময়ীর কাছে আপনার যথার্থ পরিচয় উদ্‌ঘাটন করে' শুভসিংহ আত্মহত্যায় শেষ মার্জনা লাভ করেছে।

যবন-নিন্দা সত্ত্বেও এই নাটকের কোথায়ও কোথায়ও অসাম্প্রদায়িক স্বদেশ-বোধের সুরও লেগেছে। শুভসিংহের সেই বিখ্যাত উক্তিটি, যেটি নাটকটির মধ্যে বারংবার ধ্বনিত হয়েছে, সেটি এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি-যোগ্য মনে করি :

> "কে তোমারে বক্ষে করে করেছে পোষণ ?
> কে তোরে অচল স্নেহে বক্ষে ধরে আছে ?
> কার স্তনে বহিতেছে জাহ্নবীর ধারা ?[১]
> ধন ধান্য রত্নে পূর্ণ কাহার ভাণ্ডার ?

১। এই বিশেষ চরণটি রবীন্দ্রনাথের "জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা পুণ্য পীযুষ স্তন্য-বাহিনী" এই পরিচিত চরণটির স্মারক।

কে তোরে পোহালে নিশি ; প্রভাত হইলে
পাখীদের মিষ্টতম গান শুনাইয়া
শুভ্রতম শান্ততম ঊষার আলোকে
ধীরে ধীরে ঘুম তোর দেন ভাঙ্গাইয়া ?
কে তোরে আইলে রাত্রি বুকে তুলেনিয়ে
নিদ্রারে আনেন ডাকি গেয়ে ঝিল্লীগান ?
জ্যোছনার শুভ্রহস্ত দেহে বুলাইয়া
অনিমেষ তারকার স্নেহ-নেত্র মেলি
ঘুমন্ত মুখের পানে রহেন তাকায়ে ?
এমন পাখীর গান, ঊষার আলোক,
এমন উজ্জ্বল তারা, বিমল জ্যোছনা,
কোথায় কোথায় আছে বিশাল ধরায় ?" তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

লক্ষণীয় যে, স্বদেশ এখানে মাতৃরূপে কল্পিত হয়েছে। এই পরিকল্পনার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম" সঙ্গীতের কাছে ঋণী, সন্দেহ নেই।[১] এই দৃশ্যেই শুভসিংহ স্বপ্নময়ীর কাছে নিজ-জীবনের আদর্শের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

"অযুত ভারতবাসী মোর ভাইবোন
একমাত্র মাতৃভূমি মোর পিতামাতা।"

বলাবাহুল্য, শুভসিংহ চরিত্রে এই ভারতীয় বোধের আরোপ ঐতিহাসিক কালাতিক্রম দোষে দুষ্ট। নাটকটিতে যে শুধু উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবোধের স্পর্শ লেগেছে তা-ই নয়, এই শতকের উত্তরার্ধে ধর্মান্দোলন নিয়ে ব্রাহ্ম ও হিন্দু সমাজের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হয় এতে তারও পরিচয় দুর্লভ নয়। বর্দ্ধমান-রাজ কৃষ্ণরাম রায় ও তাঁর শাস্ত্রনিপুণ পণ্ডিতমণ্ডলী এবং তত্ত্ববাগীশের বিস্তৃত চিত্রে লেখক পরিবেশ-উদাসীন আত্মতৃপ্ত হিন্দুর শাস্ত্রবিলাসকে কটাক্ষ করেছেন বলে বোধ হয়। এই পরিহাস চরমে পৌঁচেছে যেখানে স্বপ্নময়ীর জাতি-প্রেমের ছন্দোক্তিকে পর্যন্ত পিতা কৃষ্ণরাম হিন্দুদর্শনের আলোকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন (তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)।

১। আনন্দমঠের প্রকাশকাল ১২৮৯ বঙ্গাব্দে হলেও, 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি বিচ্ছিন্নভাবে পূর্বে রচিত।

কিন্তু 'স্বপ্নময়ী' নাটকে স্বদেশবোধের চেয়ে মানবিক অনুভূতিরই প্রাধান্য। এর নায়ক শুভসিংহকে স্বদেশবোধে উদ্বুদ্ধ বিদ্রোহী বীর ব'লে মনে হয় না। বরং মনে হয়, স্বদেশবোধের বিচার-হীন পন্থায় ক্লান্ত ক্ষত-বিক্ষত একটি মানব-প্রেমিক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বক্তব্য : বিচারহীন স্বদেশবোধ অন্ধ উত্তেজনা ছাড়া কিছু নয়। শুভসিংহ তার ব্যর্থ জীবন দিয়েই তার প্রমাণ করে গেলেন। এই অন্ধ উত্তেজনার নির্লজ্জ প্রকাশ ঘটেছে স্বীয় অনুচরদের হাতে শুভসিংহের লাঞ্ছনায়। বস্তুত এইখানেই শুভসিংহ চরিত্রের পরিসমাপ্তি। প্রসঙ্গত বলা যায়, জনসাধারণের অন্ধ উত্তেজনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের সিংহাসন যে একান্তই ক্ষণস্থায়ী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই দৃষ্টি সেই যুগের তুলনায় অনেক অগ্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চের 'শিশুতীর্থে' যখন অনুরূপ একটি ভাবের কথা বলেছেন তখন অর্ধ-শতাব্দী অতিক্রান্ত।

স্বপ্নময়ীর চরিত্র-পরিকল্পনাতেও ঐ একই ভাবের পুনরাবৃত্তি। স্বদেশবোধের বক্তৃতা সত্ত্বেও সে মুখ্যত ছদ্মবেশী শুভসিংহেরই প্রেমিকা। বস্তুত, তাঁর স্বদেশবোধ তাঁর প্রিয়তমেরই একটি আদর্শ আস্বাদন ছাড়া কিছু নয়। তা সত্ত্বেও সে বিদ্রোহী দলের নায়িকা এবং পিতার মনে স্বদেশবোধের প্রেরণাদাত্রী। তার আচরণ রহস্যময়, অবস্থানও বুদ্ধির অগোচর। তাই স্বপ্নময়ীকে চরিত্র না বলে নাট্যকারের মানসকন্যা বলাই সঙ্গত। নাটকটির একটি রবীন্দ্রগীতিতে যে বলা হয়েছে : "আমি স্বপনে রয়েছি ভোর, সখি আমারে জাগায়ো না"—এইটিই তার চরিত্রের সারাৎসার। এইখানে স্বীকার্য যে, পরবর্তী যুগে একাধিক বাঙলা ঐতিহাসিক নাটকে[১] এই শ্রেণীর অবিশ্বাস্য ক্ষমতার অধিকারী রহস্যময় নারী চরিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই নাটকটির আর একটি বৈশিষ্ট্য জনতার দৃশ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে জনতা-দৃশ্যের অবতারণা এই প্রথম। কিন্তু প্রথম উপস্থাপনাতেই প্রমাণ করেছেন, জনতার মনস্তত্ত্ব তাঁর সু-অবগত ছিল। যারা একদা শুভসিংহের দৈব-মহিমার অতিরঞ্জিত কীর্তন করেছে, আবার সময়ের পট-পরিবর্তনে তারাই তাঁকে জুয়াচোর প্রতারক প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করে লাঞ্ছনায় উদ্যত। জনতার এই অগভীর চরিত্র Shakespeare-এর 'জুলিয়স সীজরে'র mob-scene-কে স্মরণে আনে।

১। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলার 'জহরা', ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্যের 'বিজয়া', দ্বিজেন্দ্রলালের নুরজাহানের 'লয়লা'—এই শ্রেণীর চরিত্র।

॥ জ্যোতিরিন্দ্র সমসাময়িক অপরাপর ঐতিহাসিক নাট্যকার ॥

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে, ঐতিহাসিক নাটকের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনায়, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ঐতিহাসিক নাটকের দ্বিতীয় পর্ব (১৮৭২—১৯০৩) জ্যোতিরিন্দ্রনাথে সুরু হয়ে মুখ্যত তাঁর রচনাতেই পরিসমাপ্ত। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে, 'স্বপ্নময়ী' রচনার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর ঐতিহাসিক নাটক লেখেন নি। সেই সঙ্গে বাঙলার ঐতিহাসিক নাটকের ধারাও আপাত-বিলুপ্ত হ'ল বলা চলে। অবশ্য, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঐতিহাসিক নাটক যে একেবারেই লেখা হয়নি তা' নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতি-তর্পণ মাঝে মাঝে ঘটেছে। কিন্তু, ঐ পর্যন্তই। ঐতিহাসিক নাটকের প্রবহমাণ সজীব কোনো ধারার পরিচয় এ পর্বে আর মেলে না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক নাটকের এই আপাত-অবলুপ্তির কারণও অনুমান করা যায়। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা কারণগুলি দুটি স্থূল বিভাগে বিন্যস্ত করব। একটি আভ্যন্তরীণ কারণ। অন্যটি, আমাদের মতে বহিরঙ্গ বা সাময়িক কারণ।

আভ্যন্তরীণ কারণ হিসাবে, প্রথমেই বলতে হয়, এ যুগের ঐতিহাসিক নাটকের চারিত্রিক দুর্বলতার কথা। জ্যোতিরিন্দ্র-নাটকে উচ্চ-ঘোষিত স্বাদেশিকতার কথা আমরা লক্ষ্য করেছি। স্বদেশ-বোধ বা অন্য যে কোন সাময়িক-বোধ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য শিল্পের অন্তরায়—একথা আমরা বলিনা। উদাহরণস্বরূপ, এ যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাসগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আনন্দমঠ বা সীতারাম, রচনা-কালীন যুগের স্বদেশবোধে অনুরঞ্জিত হ'য়েও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-লোকে উত্তীর্ণ। কিন্তু এযুগের ঐতিহাসিক নাটকগুলি সম্পর্কে এ উক্তি প্রযোজ্য নয়। তার কারণ ঐতিহাসিক রচনাকে কালের বিচারে উত্তীর্ণ করার জন্য প্রয়োজন গভীর ঐতিহাসিক বোধ। এটি বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। তাই তাঁর আনন্দমঠের আনন্দেরা কিংবা সীতারামের সীতারাম কেউই ইতিহাসের কক্ষ-বিচ্যুত একেবারে উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশ-ব্রতী নয়। আনন্দ-মঠের সন্ন্যাসীদের কাছে ব্যক্তি-প্রেমই শেষ পর্যন্ত বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। স্বদেশ-প্রেম নয়। সীতারামও তাঁর হিন্দুরাজ্য গড়ে তোলার সংকল্প থেকে বিচ্যুত হয়েছেন ঐ একই কারণে। আসলে, বঙ্কিম-চন্দ্র তাঁর সহজাত ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বুঝেছিলেন, উনবিংশ শতকের নির্ভেজাল

স্বদেশবোধের আদর্শে অতীত ইতিহাসের কোন চরিত্রকে ধর্মান্তরিত করা অস্বাভাবিক-ই শুধু নয়, হাস্যকরও। বলা বাহুল্য, এ যুগের নাট্যকারদের রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই ঐতিহাসিক দৃষ্টির কোন পরিচয় নেই। ফলে, তাঁদের রচনা সাময়িক চাহিদা মিটিয়েই ফুরিয়ে যেত, স্থায়িত্ব লাভ করেনি[১]।

এ সময়ের বাঙলা নাটকের ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যায়, ঐতিহাসিক নাটকের এই সাময়িক বিরতিটি মোটেই আকস্মিক নয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ বাঙলা নাট্য-জগৎ এক একক নাট্য-প্রতিভায় নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল বলা চলে। ইনি স্বনামধন্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ। বাঙলা নাটকের ইতিহাস-প্রণেতারা[২] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকের বাঙলা নাটকের ইতিহাসকে এঁরই নামে 'গিরিশ যুগ'—অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। শেষ জীবনে বিংশতি শতকের প্রথম দশকে ইনি কয়েকটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক রচনা করলেও, এঁর ঊনবিংশ শতকের পরিচয়—এবং মুখ্য পরিচয় পৌরাণিক নাট্যকার হিসাবেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশীভাবাত্মক ঐতিহাসিক নাটকের প্রতি গিরিশচন্দ্র প্রথমাবধিই বীতশ্রদ্ধ। তিনি স্পষ্টই বলেছেন:

"ঐতিহাসিক নাটক দুই একখানি হইয়াছে, কৃতবিদ্য অনেক লোক তাহার প্রশংসাও করিয়াছে কিন্তু সমালোচকেরা সে স্থানে নিস্তব্ধ ছিলেন।……ইতিহাসবিদ্ কয়েকজন সকল মর্ম বুঝিবেন, কিন্তু তাহাতে নাট্যকারের ব্যবসা চলিবে না।…… না চলুক, যদি চরিত্র পাওয়া যাইত, যাহা পুরাণে নাই, তাহা হইলেও কথা ছিল। ঐতিহাসিক নাটক সমস্তই স্থানীয়। Shakespeare-এর ঐতিহাসিক নাটক স্থানীয়।……স্থানীয় প্রসঙ্গ স্থানেই চলিয়াছে।……কেবল ঐ সকল নাটক লিখিয়া সেক্সপীয়ার হইতেন না"।—পৌরাণিক নাটক—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।—

এই তো গেল তাঁর ঐতিহাসিক নাটক-সম্বন্ধে ধারণা। আবার, পৌরাণিক চরিত্রের প্রতি তাঁর কি গভীর আকর্ষণ ছিল বোঝা যায়, তাঁর-ই আর একটি উক্তিতে:

"যাঁহারা পৌরাণিক নাটকের বিরোধী, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না যে পৌরাণিক চরিত্র কিছুই তাঁহারা উপলব্ধি করেন না। যদি দেখিতেন ও বুঝিতে পারিতেন,—ব্যাস বাল্মীকি রচিত উচ্চ বা নীচ চরিত্রের বাঙ্গালায় অদ্যাবধি তুলনা

১। এই শ্রেণীর নাটকের উদাহরণ হ'ল, হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান' (১৮৭৪), উমেশচন্দ্র গুপ্তের 'বীরবালা' (১৮৭৫) 'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক' (১৮৭৬) প্রভৃতি। এদের বিস্তারিত উল্লেখ করে এ-রচনা ভারাক্রান্ত করা নিষ্প্রয়োজন।

২। অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

হইব্যর সম্ভাবনা নাই; আর কোন দেশে হইলেও হইতে পারে" ।—পৌরাণিক নাটক, গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

আর জাতীয়তাবোধের আদর্শ-সম্বন্ধেও গিরিশচন্দ্রের ধারণা ছিল স্বকীয়তায় বিশিষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আলোচনাতেই আমরা দেখেছি, জাতীয়তাবোধের য়ুরোপীয় আদর্শ (Patriotism) সে যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী চিন্তানায়কদের আর তৃপ্তি দিতে পারছিল না।[১] দেশ-প্রেমের সুলভ উচ্ছ্বাসের চেয়ে ধর্ম[২]-অনুশীলনে চরিত্র গঠনই স্বাধীনতালাভের যোগ্য পন্থা, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শেষ পর্যায়ের উপন্যাসে ও প্রবন্ধে বাঙালীকে এ-কথা শুনিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রের জাতীয়তাবোধ কতকটা সেই আদর্শেই গঠিত, যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মবোধের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের ধর্মবোধের সাদৃশ্যের চেয়ে বৈষম্যই বেশী। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মবোধে ঊনবিংশ শতকের যুক্তিবাদী মানুষের বুদ্ধি-দীপ্ত ঐতিহ্য-নিষ্ঠা। গিরিশচন্দ্রের ধর্মবোধ অতীত-মুখী, আবেগ-প্রবণ। বুদ্ধির নিষ্কম্প্র সংযমের পরিবর্তে হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগেই তাঁর ধর্মবোধ বিঘোষিত। হয়ত প্রথম জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার পরে রামকৃষ্ণে আশ্রিত হওয়া এর কারণ হ'তে পারে। কিংবা পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি আবাল্য অনুরাগ তাঁকে এ ব্যাপারে প্রেরণা দিয়ে থাকবে। কারণ যাই হোক, এই ধর্মবোধ, সঠিকভাবে বলতে গেলে ধর্মোন্মাদনা তাঁর জীবনে এবং নাটকে[৩] বহুদূর ব্যাপ্ত। সমালোচকদের সাক্ষ্য না নিয়ে তিনি এ-বিষয়ে নিজে কী বলেছেন দেখা যাক্ঃ

"জাতীয় বৃত্তি পরিচালিত ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতীয় হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয় মর্মে ধর্ম। দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারিবেন না। ভারত ধার্ম্মিক। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হল সঞ্চালন করিতেছে, তাহারাও কৃষ্ণ নাম জানে, তাহাদেরও মন কৃষ্ণ নামে আকৃষ্ট। যদি নাটক সার্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণ নামেই হইবে।"—পৌরাণিক নাটক—গিরিশচন্দ্র।

গিরিশচন্দ্র এই আদর্শে নাটক লিখতে থাকেন। তাঁর সেই সব পৌরাণিক নাটক আসাধারণ জনপ্রিয়তাও অর্জন করতে পেরেছিল। এই সময়ে বাঙলা

১। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের আলোচনা স্মরণীয়।

২। ধর্ম এখানে সংস্কার-মুক্ত ব্যাপক অর্থেই গ্রহণীয়।

৩। জীবনের প্রতি গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত গুরুগম্ভীর। নিজের রচনাকে যতদূর সম্ভব জীবনানুগ করাই ছিল তাঁর ব্রত। তিনি নিজেই বলেছেনঃ "আমি বই লিখতে লোককে ফাঁকি দিইনি। যেটা feel করেছি তাই সবার ভিতরে বিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি।"—গিরিশচন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য, কুমুদবন্ধু সেন। পৃঃ—১৬।

দেশে ধর্মীয় আন্দোলনের যে সাড়া পড়ে যায়, বিশেষ হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারের যে স্বপ্ন বাঙালী হিন্দুর চিত্তকে আচ্ছন্ন করে থাকে, তার প্রভাব সাহিত্যেও সংক্রমিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে উপন্যাস রচনা থেকে বিরত হয়ে ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তৎকালীন 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আদি ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ থেকে ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'ন। এমন কি, সাময়িক ধর্মান্দোলন সম্পর্কে কিশোর রবীন্দ্রনাথকেও এ-সময় লেখনী চালনা করতে দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন 'কৃষ্ণ চরিত্র' রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন, নবীনচন্দ্র সেনও তেমনি, 'পলাশির যুদ্ধ' রচনার পর 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত'[১] —রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। এসব দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়, ঊনবিংশ শতকের শেষ দুই দশকে ধর্মাশ্রিত রচনাই বাঙালী পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হয়। গিরিশচন্দ্র বাঙালীর এই প্রবণতাকে সম্যক্ ব্যবহার করলেন।[২] বাঙালীর এই পরিবর্তমান মানসের দিকে লক্ষ্য রেখেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথও সময় বুঝে ঐতিহাসিক নাট্য-রচনা বন্ধ করলেন। এ সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি অমৃতলাল বসুকে বলেছিলেন:

"নাট্য জগতে গিরিশচন্দ্র প্রবেশ করিয়াছেন, আমার নাটক রচনার আর প্রয়োজন নাই।" —জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মন্মথনাথ ঘোষ, পৃঃ—১০৯।

মনে রাখা উচিত, যে-গিরিশচন্দ্রের হাতে নাট্য-রচনার ভার অর্পণ ক'রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কালের অপ্রতিরোধ্য নির্দেশকে বুদ্ধিস্মিত স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তিনি একান্ত ভাবেই ঊনবিংশ শতকের পৌরাণিক নাট্যকার গিরিশচন্দ্র। কাজেই বলা যেতে পারে এটি শুধু গিরিশচন্দ্রের হাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নয়, পৌরাণিক নাটকের হাতে ঐতিহাসিক নাটকেরই আত্মসমর্পণ।[৩]

১। কুরুক্ষেত্র, প্রভাস ও রৈবতক। এই তিনটি কাব্যকে একত্রে ঐ আখ্যা দেওয়া হয়।

২। "One might naturally ask why Girish turned to mythology instead of to history? Apart from other reasons, he was drawn to mythology by the force of circumstances. The country was not prepared to get into history nor for the reception of ideas of nationalism"—Indian stage (Vol. III)—Hemendra Nath Dasgupta.

৩। একদিকে চলছিল স্বাদেশিক আন্দোলন, অন্যদিকে কেশব সেনের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন। জনসাধারণ প্রথমটির দিকে ঝুঁকলেও দ্বিতীয়টির প্রতি আতঙ্কই ছিল বেশি। তাই শুরু হ'ল যাকে বলা যেতে পারে বাঙলার counter-reformation আন্দোলন। তারই প্রভাব বেশি হ'ল—ফলে স্বদেশবোধ গৌণ হয়ে গেল, ইতিহাস-চর্চা স্তব্ধ। এর সমন্বয় ঘটল বঙ্কিমে-নবীনে-বিবেকানন্দে। স্বদেশ ও স্বধর্ম এক হ'য়ে গেল। গিরিশ এই counter-reformation-এর অন্যতম নায়ক

এই পর্বে যে গিরিশচন্দ্র একেবারেই ঐতিহাসিক নাটক লেখেন নি, তা' নয়। ইতিহাসের সঙ্গে ক্ষীণতম যোগসূত্রে তিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি ছদ্ম ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। তাদের তালিকা মোটামুটি এই রকম: 'আনন্দ রহো (১৮৮১), 'বুদ্ধদেব চরিত' (১৮৮৫-৮৬), 'চণ্ড' (১৮৯০), 'কালা পাহাড়' (১৮৯৬), 'ভ্রান্তি'[১] (১৯০২)। কিন্তু এই সমস্ত নাটকে ইতিহাসের মর্যাদা কোথাও রক্ষিত হয়নি। তাঁর পৌরাণিক নাটকের ধর্মভাব এবং ভক্তি-প্রাবল্য এখানেও আত্মপ্রকাশ খুঁজেছে। ফলে, ইতিহাসের তথ্য দূরে থাকুক, পটভূমিকা-টুকুও লুপ্ত হয়ে গেছে সময়ে সময়ে। আমাদের মতে এগুলিতে ইতিহাসের উল্লেখ মাত্র থাকলেও অন্তরঙ্গ লক্ষণে এদের ধর্মাত্মক পৌরাণিক নাটকেরই অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন। ইতিহাসকে তিনি কতদূর লঙ্ঘন করতে পারেন, তার চরমতম দৃষ্টান্ত বোধ করি 'কালা পাহাড়'। এর চিন্তামণি চরিত্রটি চিন্তায় আচরণে কথায় রামকৃষ্ণ দেবেরই অব্যয় প্রতিধ্বনি। এতে বা 'বুদ্ধদেব চরিতে' ধর্মতত্ত্বেরই নিগূঢ় আলোচনা। এই সমস্ত কারণে আমরা আমাদের ঐতিহাসিক নাটকের আলোচনায় এই সব নাটকের আর বিস্তারিত আলোচনা করব না, তবে এই প্রসঙ্গে এটুকু লক্ষণীয় যে, গিরিশচন্দ্র তাঁর নাট্যকার জীবনের সূত্রপাত করেন একটি ঐতিহাসিক নাটক লিখে। অবশ্য, 'আনন্দ রহোর' আগে মঞ্চের প্রয়োজনে তাঁকে 'মায়াতরু' ও 'মোহিনী প্রতিমা'—এ দুটি গীতিনাট্য এবং 'আলাদিন' নামে একটি পঞ্চরং রচনা করতে হয়। কিন্তু তাঁর প্রথম গম্ভীর রচনা 'আনন্দ রহো'ই। আরও লক্ষণীয় যে, নাটকটিতে তাঁর ধর্মভাব একেবারে অনুপস্থিত না হ'লেও ইতিহাসের তথ্য-পঞ্জীও দুর্লভ নয়; জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের 'অশ্রুমতী' নাটকের আদর্শে তিনিও এ-নাটকের বিষয়বস্তু করেন আকবর ও প্রতাপ সিংহের সংগ্রাম। কিন্তু কল্পিত ঘটনার বাহুল্যে নাটকটির ঐতিহাসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল ব'লে বোধ হয়। তৎকালীন 'ভারতীতে' এর কঠোর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। জনপ্রিয়তার দিক থেকেও নাটকটি সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয় নি। ঐতিহাসিক নাটকে প্রথম পদক্ষেপের ব্যর্থতায় তিনি পৌরাণিক নাটকে মনোনিয়োগ করেন। এর ঠিক পরবর্তী রচনা 'রাবণ বধ' নাটক অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। রঙ্গমঞ্চের পরিচালকের পক্ষে সাময়িক বিজয়-সাফল্য কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। গিরিশচন্দ্রও এর পর থেকে মুখ্যত পৌরাণিক নাটকেই নিমগ্ন থেকে ঐতিহাসিক নাটকের পথ রুদ্ধ করলেন।

১। 'ভ্রান্তি'র সঙ্গে ইতিহাসের যোগসূত্র ক্ষীণতম বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এইবার ঐতিহাসিক নাটকের আপাত-অবলুপ্তির সাময়িক কারণগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলি মূলত তৎকালীন রঙ্গমঞ্চ-সম্পর্কিত। নাটকের পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় রঙ্গমঞ্চ-প্রসঙ্গের অনিবার্যতা স্বীকার করেও বলব, বাঙলা রঙ্গমঞ্চের ধারাবাহিক বিবরণী দেওয়া এই আলোচনার পরিধি সীমার বাইরে। তাই, সে চেষ্টায় বিরত থেকে মোটামুটিভাবে এ-যুগের ঐতিহাসিক নাটকের ওপর তার প্রভাবটুকুই আলোচনা করব।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে, জাতীয় রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ঐতিহাসিক নাটকের পরিবেষণা সুসাধ্য ছিল না। কেননা, ঐতিহাসিক নাটক অভিনয় করাতে হলে কী দৃশ্য কী পোষাকে খরচা প্রচুর। সৌখীন নাট্যমঞ্চের অধিকর্তারা স্বভাবতই এ ব্যয়ভার বহনে অপারগ ছিলেন। এই কারণেই গিরিশচন্দ্র কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তির সহযোগে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজারে একটি সখের যাত্রা প্রতিষ্ঠিত করেন।[১] এখানে কয়েকবার 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের অভিনয় হয়। কিন্তু বৎসরাধিক কাল পরে এটি একটি থিয়েটার দলে পরিণত হয়। অল্প ব্যয়ে সহজে মঞ্চস্থ করার মত তারা দীনবন্ধুর সামাজিক নাটক 'সধবার একাদশী'কে নির্বাচন করেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকে দীনবন্ধু মিত্রের নামে উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন ঃ

"যে সময়ে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হয়, সে সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত, কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজ চিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন নাই"।...ইত্যাদি।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হ'লে আর্থিক সমস্যা অনেকটা মিটে গেল, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটাই সব নয়, ঐতিহাসিক নাটকের রাজকীয় জাঁকজমক বা ঐশ্বর্যকে ঠিক মতো রূপ দিতে গেলে যে পরিমাণ দৃশ্যসম্ভার বা রূপবৈচিত্র্যের দরকার তৎকালীন রঙ্গমঞ্চে তা একান্ত দুর্লভ ছিল। এ-সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যে বিবরণ দিয়েছেন তা যেমন কৌতুকপ্রদ তেমনি চিন্তাবহ।

"যাহারা অভিনয় করিবে, তাহারা সে-সব চরিত্র বোঝে না; বরের সজ্জা পরিয়া সমস্ত জগতের রাজা আবির্ভূত হন;—রাজমুকুট, রাজ-অলঙ্কার কুমারটুলী হইতে আইসে,...একখানি রাজসভা বহুদিন হইতে চিত্রিত আছে,

১। দ্রষ্টব্য ঃ 'গিরিশচন্দ্র' ঃ অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৮।

সমস্ত পৃথিবীর রাজা সেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হন" ।—'বর্ত্তমান রঙ্গভূমি', গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মঞ্চব্যবস্থার এই হাস্যকর অসংগতি যে কোনো সচেতন নাট্যকারের উৎসাহকে স্তিমিত করার পক্ষে যথেষ্ট। একথা ঠিক যে, পৌরাণিক নাটকেও দৃশ্য-বিন্যাস কিছুটা অসাধারণ। কিন্তু ভক্তিভাবটিই সেখানে মুখ্য, ঐতিহাসিক নাটকের মত কোনও নির্দিষ্ট শতাব্দীর চেতনা সেখানে নেই। তাই তার পরিবেষণাও ঐতিহাসিক নাটকের তুলনায় আটপৌরে। সমসাময়িক মঞ্চ সম্বন্ধে এ অভিজ্ঞতা গিরিশচন্দ্রকে ঐতিহাসিক নাটক-রচনায় উৎসাহিত করেনি—এমন অনুমান অসঙ্গত নয়।

এ ছাড়া আরও একটি কারণ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই যুগের ঐতিহাসিক নাটকে জাতীয় ভাবোন্মাদনার কথা আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। ঐতিহাসিক নাটক ছাড়াও জাতীয় ভাবোন্মাদনায় এ-সময়ে বাঙলার নাট্য-সাহিত্যে একটি নতুন ধারার সূচনা হয়। সমসাময়িক জাতীয় ভাবের প্রত্যক্ষ অবলম্বনে এই সময়ে এক শ্রেণীর নাটক লেখা হ'তে লাগল। নাট্য-সমালোচকেরা সম্ভবত এর নামকরণ করবেন—'রাজনৈতিক নাটক'। এই শ্রেণীর নাটকের প্রথম স্মরণীয় দৃষ্টান্ত কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' (১৮৭৩)। বাঙলা ঐতিহাসিক নাটকের সঙ্গে একই প্রেরণায় সম্ভূত হ'লেও এই শ্রেণীর নাটকের সাময়িক আবেদন তীব্রতর। 'ন্যাশন্যাল থিয়েটারে' নাটকটি মঞ্চস্থ ক'রে অমৃতলাল বসু সগর্বে বলেছিলেন :

"এই 'ভারতমাতা'র অভিনয় বড়ই শুভক্ষণে আরম্ভ হয়েছিল। সাধারণে বিষয়টি বড় appreciate করলে। 'ভারত মাতা'র ক'খানা প্রচলিত গান ছিল, সেগুলোর আদর এমন বেড়ে গেল যে, শেষে আমাদের যেদিন ভারত মাতার অভিনয় না হ'ত সেদিন দর্শকের তুষ্টির জন্য প্লাকার্ডের পরিশেষে ভারত সঙ্গীত বলে বিজ্ঞাপন দিতে হ'ত" ।—'গিরিশচন্দ্র,' অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

এতে ঐতিহাসিক নাটকের তথ্যগত দায়িত্ব না থাকায় সমসাময়িক জাতীয় আন্দোলনের প্রকাশ হ'ল অকুণ্ঠ, দুর্নিবার। ঐতিহাসিক নাটকের তুলনায় এর জনপ্রিয়তা হ'ল আরও বেশি।

কিন্তু এই নিরঙ্কুশ উদ্দামতায় শাসন নেমে এল এক অভাবিত কোণ থেকে। স্বদেশবোধের উত্তেজনাকে ভাঙ্গিয়ে এই শ্রেণীর নাটক যখন তার চরম স্তরে উপনীত, হঠাৎ দেখা গেল তৎকালীন ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ

করতে উদ্যত। যে বিশেষ রচনাটির উপলক্ষ্যে এই হস্তক্ষেপ ঘটল, সেটি সে-যুগের জনপ্রিয় লেখক উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটক (১৮৭৫)। নাটকটিতে ম্যাজিস্ট্রেটের অত্যাচারের বীভৎস বর্ণনা থাকায় গভর্ণমেণ্ট অশ্লীলতার অভিযোগ এনে এটিকে দণ্ডিত করতে মনস্থ করেন। হাইকোর্টের বিচারে পরাজিত হ'য়ে গভর্ণমেণ্ট কিছুদিন পরে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' পাশ করলেন, (Dramatic Performances Control Bill.) Bill-টির এক জায়গায় আছে: "That whenever the Government was of opinion that any dramatic performance was···likely to excite feeling of dissatisfaction towards the Government···Government might prohibit such performances."—রাজনৈতিক নাটকের ধারাও ক্রমে প্রশমিত হয়ে এল। একই কারণে জাতীয় ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটক রচনাতেও উৎসাহ প্রকাশ সম্ভব হ'ল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা ঐতিহাসিক নাটকের অবলুপ্তির, সঠিক বলতে গেলে আপাত-অবলুপ্তির, ইতিহাস হ'লো এই। নাটকের চরিত্রগত দুর্বলতা ছাড়াও ওপরে আলোচিত সাময়িক কারণগুলিও বিশেষ বিবেচ্য ব'লে আমাদের বিশ্বাস। ঐতিহাসিক নাটকের পুনরুজ্জীবনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত।

॥ রবীন্দ্রনাথ ॥ (আদিপর্ব)

প্রচলিত অর্থে ঐতিহাসিক নাটক রবীন্দ্রনাথ একটিও রচনা করেন নি। ইতিহাসের আবরণে তিনি এই পর্বে যে ক'টি নাটক রচনা করেন, তাদের স্বাদ বিচিত্র। আমরা এবার তাঁর এই শ্রেণীর নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করব।

বস্তুত, শুধু ঐতিহাসিকই নয়, পঞ্চাঙ্কে সমাপ্ত বস্তুলীন পাশ্চাত্ত্য নাটকের যে আদর্শ ঊনবিংশ শতকের বাঙালী নাট্যকারের অভীষ্ট ছিল, রবীন্দ্রনাথের পরিণত প্রতিভার কোথায়ও তার অনুগমন লক্ষ্য করা যায় না। এমন কি তাঁর অপরিণত বয়সের নাট্য-রচনাতেও একটি স্বকীয় নাট্য-বন্ধের আভাস দুর্লভ নয়। Thompson থেকে আরম্ভ ক'রে এ-যুগের বিশিষ্ট সমালোচকেরা পর্যন্ত সকলেই রবীন্দ্রনাট্যের এই নিজস্বতার কথা স্বীকার করেছেন। Thompson বলেন, "In Rabindranath's drama, the pressure of thought often strangles the action."—

Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist—by Edward Thompson.—Pp., 89.

ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মতে, "তাঁহার হাতে নাটক যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা মোটেই ঘটনাগত নহে, ভাবগত। এবং এই জন্য রবীন্দ্র-নাট্যের একটা বিশেষ রূপ আছে, যাহা বাঙলা নাট্য সাহিত্যে ত নাই-ই, সংস্কৃত নাট্যেও ঠিক তেমনই দেখা যায় না।"—রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—নীহার রঞ্জন রায়, পৃঃ—১০৮।

রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বিশী বলেছেন, "তাঁহার কবিতার মতই তাঁহার নাটকেরও, বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনারই একটি মাত্র মূল সুর।"—রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ (১ম খণ্ড : প্রস্তাবনা)।

সমালোচকের কথা দূরে থাক, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর এই গীতিপ্রবণ মানস সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাঁর এই পর্বেরই (১৮৮১-১৯০৪) একটি নাটকের উৎসর্গে এই সম্বন্ধে তিনি সকৌতুক উল্লেখ করেছেন :

"কেহ বলে, ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি" ।।[১]

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের নাট্য সম্ভার প্রথাবদ্ধ নাট্য রচনার ব্যতিক্রম বলেই বাঙলা নাটকের আধুনিক সমালোচক[২] নাটকের ধারাবাহিক আলোচনার বাইরেই তাঁর উল্লেখের পক্ষপাতী।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি তাঁর তথাকথিত ঐতিহাসিক নাটকেও পরিস্ফুট। তথাকথিত এই জন্যে যে, ঐতিহাসিক নাটক বলতে সাধারণত আমরা যা জেনে এসেছি, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটক তার ধার দিয়েও যায় না। সন-তারিখ ঘটনার নির্দিষ্ট ইতিহাসের কোনও তথ্যকে তাঁর সমগ্র নাট্য সাহিত্যের মধ্যে খুঁজে পাওনা দুষ্কর। ইতিহাস-তথ্যের ক্ষীণ যোগসূত্র একান্ত বিরলভাবে কোথাও কখন দেখা গেলেও (যেমন, 'প্রায়শ্চিত্ত,' এটি মুখ্যত বঙ্গাধিপ পরাজয় অবলম্বনে লেখা 'বৌঠাকুরাণী হাটে'র নাট্যরূপ) তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের মঞ্চে ইতিহাস প্রায়ই নেপথ্যগত। একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের তথ্যের চেয়ে ইতিহাসের সত্যকেই বেশি মূল্যবান জ্ঞান করতেন। এটি তাঁর ইতিহাস-সম্বন্ধে ক্রম-পরিণত চেতনার উপলব্ধি। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকেও

১। বিসর্জন নাটকে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি উৎসর্গ দ্রষ্টব্য।
২। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য দ্রষ্টব্য।

এই ধরণের একটি বিবর্তন ধারা লক্ষ্য করা যায়। পরিণত-পর্বে (১৯০৬ থেকে পরবর্তী কাল) তিনি এমন কয়েকটি নাটক রচনা করেন, যা প্রচলিত ঐতিহাসিক নাটকের বহির্লক্ষণে আক্রান্ত না হ'য়েও গভীরতর ঐতিহাসিক বোধে উদ্বুদ্ধ। আমরা ঐতিহাসিক নাটকের ভূমিকায় (১ম অধ্যায়) লক্ষ্য করেছি যে ইতিহাসের কোন নির্দিষ্ট ঘটনা বা চরিত্রের উল্লেখ না করেও, সার্থক ঐতিহাসিক নাটক লেখা যায়, যদি বর্ণিত যুগ-সম্বন্ধে নাট্যকারের সজাগ ঐতিহাসিক-বোধ (Strong historical sense) থাকে। রবীন্দ্রনাথের পরিণত পর্বের এই শ্রেণীর রচনাতে ইতিহাসের পরিচিত ব্যক্তি বা ঘটনা না থাকলেও ইতিহাসের এই তীক্ষ্ণ বোধ অভাবিত নয়। সুতরাং তাদের আমরা ঐতিহাসিক নাটক বলারই পক্ষপাতী। পর্ব-বিভাগের সঙ্গতি রাখার জন্য আমরা বর্তমান অধ্যায়ে তাদের উল্লেখে বিরত হয়ে, শুধু তাঁর প্রথম পর্বের ঐতিহাসিক নাটকগুলিই আলোচনা করব।

আমাদের আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথ ছদ্ম ইতিহাসের আবরণে যে কটি নাটক বা নাট্যকাব্য রচনা করেন, তাদের তালিকা ও প্রকাশ-কাল নিম্নোক্তরূপ—রুদ্রচণ্ড (১৮৮১), রাজা ও রাণী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০), মালিনী (১৮৯৬) ও মুকুট।[১] এগুলির বিশেষ আলোচনার আগে সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের এ পর্বের ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। এ পর্যন্ত বাঙলা ঐতিহাসিক নাটকের আলোচনায় দেখে এসেছি যে, উনবিংশ শতকের বাঙালীর স্বদেশ বা স্বজাতি-বোধের মধ্যেই এই নাটকের প্রেরণা নিহিত। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকে কিন্তু উগ্র সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের পরিচয় নেই। ভূমিকার আলোচনা থেকেই প্রতীয়মান, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের বস্তু-ধর্মকে অতিক্রম ক'রে প্রায়ই চরিত্র-বিশেষে নিজের ভাবনা চিন্তাগুলিকে অভিব্যক্ত করেছেন। কাজেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন জাতীয় আন্দোলনকে কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তার কিছু পরোক্ষ পরিচয় এই শ্রেণীর নাটক থেকে পাওয়া অসম্ভব নয়। সেই দিক থেকে এই নাটকগুলির গুরুত্ব খুব বেশী বলেই আমাদের বিশ্বাস। আপাত-বিরোধী শোনালেও একথা সত্যি যে, প্রবন্ধে অনেক সময় লেখক আত্মগোপনে বাধ্য হন। সরাসরি মত প্রকাশে সাময়িক বাধা অনেক। কিন্তু নাটকে বা উপন্যাসে লেখক যে

১। মুকুট অবশ্য বালকদের জন্য লেখা হয় এবং নাট্যাকার রচনা কাল ১৩১৫ বঙ্গাব্দ। কিন্তু বালক-বোধ্য গল্প হিসাবে প্রথম প্রকাশ 'বালক' পত্রিকায় ১২৯২ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ—। দ্রষ্টব্য—বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—সুকুমার সেন—২৫৩ পৃঃ, পাদটীকা ১।

বলা বাহুল্য, সমসাময়িক দেশবাসীর তুলনায় রবীন্দ্রনাথের এ চিন্তাধারা অনেক অগ্রসৃত।[১]

মনে রাখা উচিত, ওপরে রবীন্দ্রনাথের যে স্বদেশবোধের কথা বলা হ'ল সেটি তাঁর চিন্তাধারার ক্রম-পরিণতির পথে উত্তরোত্তর সংলব্ধ। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যই হ'ল একটি সন্তর্পিত কিন্তু অনিবার্য ক্রমপরিণতি। অল্প অভিনিবেশেই প্রতীয়মান যে, তাঁর চিন্তাধারায় কোন আকস্মিক চমক নেই। সাধারণত প্রচলিত চিন্তাধারাকে বরণ ক'রে তার ভিতর দিয়েই তাঁর প্রথম পদক্ষেপের সূচনা। কিন্তু ক্রমপরিণতির পথে পথে তাঁর এই চিন্তা উত্তর কালে এমন এক স্তরে উত্তীর্ণ যা সমসাময়িক চিন্তাধারার ঊর্ধ্বে আপন মৌলিকতায় ভাস্বর।

রবীন্দ্রনাথের দেশ-হিতৈষণা সম্বন্ধেও এ-উক্তি প্রয়োক্তব্য। দেশানুরাগ-সম্বন্ধে তাঁর প্রথম দিকের প্রবন্ধগুলিতে তৎকালীন চিন্তানায়কদের প্রভাব সুস্পষ্ট। এমন কি, আত্মশক্তির উদ্বোধ যে-রবীন্দ্রনাথের জীবন ব্রত, তিনিও ঊনবিংশ শতকের প্রবন্ধ বিশেষে (মন্ত্রী অভিষেক, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ) সে যুগের কংগ্রেসের আবেদন মূলক মনোভাবের সমর্থকও হয়েছেন কখনও কখনও। পরবর্ত্তী কালে এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখেছেন :

"আমরা ছিলুম দাঁড়ের কাকাতুয়া, পাখা ঝাপটিয়ে চেঁচালুম পায়ের শিকল আরও ইঞ্চি কয়েক লম্বা করে দেবার জন্য। আজ বলচি দাঁড়ও নয় শিকলও নয়—পাখা মেলব অবাধ স্বরাজ্যে"—(প্রভাত মুখো : রবীন্দ্র জীবনী—১ম খণ্ডের ২২০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশ)।

স্বারাজ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র চিন্তাধারার সুস্পষ্ট পরিচয় বিংশ শতকের সূচনা থেকেই পাওয়া যায়। এই শতকের প্রথম দশকে স্বদেশী-আন্দোলনের সময় দেশময় যে সুলভ ভাবোচ্ছ্বাসের প্লাবন আসে, রবীন্দ্রনাথের এই সময়কা

১। সে যুগে অনেকে-ই, তাই, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবোধের বিশেষ, তাঁর Nation Idea-র পা নিতে গিয়ে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন। এই সোচ্চার কলরোলে কয়েকটি কণ্ঠস্বরের মধ্যে একক ভাবে যাঁর ঘোষণাটি—রাজনৈতিক কারণেই মনোযোগ আকর্ষণ না ক'রে পারে না, সেটি হ'ল তৎকালীন (১৯১৭) বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের অভিভাষণ Nation Idea-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিজন চিন্তা যে কার্যকরী নয়, এমন কি তা' যে সে যুগের য়ুরোপী পণ্ডিতদের কাছ থেকেই স্বীকৃতিহীন ঋণমাত্র, দাশ মহাশয় নিঃসংশয়ে তা' ঘোষণা ক'রে জানিয়েছেন "কিন্তু সূর্য্যের চেয়ে বালীর তাপ বেশী ; আমাদের দেশের এই সব নকল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বে যে তাহাদের কোন মতকে কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না। এমন কি, যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদে আন্দোলনের সময় বাঙ্গালার মাটি বাঙ্গালার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের কা প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ এখন স্যার রবীন্দ্রনাথ, এবার আমেরিকায় ঐ মতটি নাকি খু জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন।"—দ্রঃ "বাঙ্গালার কথা", চিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রবন্ধ সমূহে তাঁর অন্তর্নিহিত দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টি-প্রসূত। এই স্বদেশ উচ্ছ্বাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে চিন্তা পোষণ করতেন তাদের মোটামুটি পরিচয় দিতে তাঁরই কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধার করছি ঃ

"আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া 'মা' শব্দটিকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি। এই শব্দের দ্বারা হৃদয়াবেগ এতই জাগিয়া উঠে যে, আমরা মনে করিতে পারি না, দেশের মধ্যে 'মা'কে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই।···দেশের সাধারণ গণসমাজ যদি স্বদেশের মধ্যে মা'কে অনুভব না করে তবে আমরা অধৈর্য্য হইয়া মনে করি, সেটা হয় তাহাদের ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতার ভাণ, নয় আমাদের শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে মাতৃবিদ্রোহে উদ্বোধিত করিয়াছে। কিন্তু আমরাই যে 'মা'কে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নাই এই অপরাধটা আমরা কোনো মতেই নিজের স্কন্ধে লইতে রাজি নহি।···আমাদের দুর্ভাগ্যই এই, আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার ধৈর্য্য আমাদের নাই; আমরা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে দ্রুত বেগে পদানত করিবার জন্য চেষ্টা করি।"

'সদুপায়'—সমূহ (রবীন্দ্র রচনাবলী দশম খণ্ড, পৃঃ ৫২৬-৭)।

তাই স্বাধীনতার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করার আগে জাতিকে আত্মনির্মাণের আহ্বান জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ভাষায় ঃ

"পাণ্ডবেরা পূর্ব গৌরব গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া বল সঞ্চয় করিয়াছেন, সংসারে উদ্‌যোগ পর্বের পূর্বে অজ্ঞাতবাসের পর্ব।··· আমাদেরও এখন আত্মনির্মাণ—জাতি নির্মাণের অবস্থা, এখন আমাদের অজ্ঞাত-বাসের সময়।"—'ইংরেজ ও ভারতবাসী'—রাজা প্রজা (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম, পৃঃ ৩৯৮)

তাছাড়া এই আন্দোলনের পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ বক্তৃতা-পরায়ণ নেতৃবৃন্দের প্রতিও রবীন্দ্রনাথের আস্থা দেখা যায় না। তিনি মনে করতেন, উচ্চ বক্তৃতা মঞ্চে নয়, সাধারণ দেশবাসীর সম-ভূমিতেই প্রকৃত দেশনেতার সঙ্গত আবির্ভাব। কিন্তু সাধারণের সঙ্গে নাড়ীর যোগ থাকলেও, প্রকৃত দেশনেতার (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'গুরুর') শ্রেষ্ঠ-দীক্ষা নির্লিপ্তির দীক্ষা, অন্ধ আবেগ বা উত্তেজনার নয়। এ-সম্বন্ধে তাঁর ধারণা তাঁর নিজের ভাষাতেই ব্যক্ত করি ঃ

"আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে, পরম ধৈর্য্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জাতীয় বিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সমস্ত দেশ অনিবার্যবেগে যে আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহু যত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিস্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিত জ্ঞানকে অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে। তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন আমাদের চির পরিচিত ভাষায় আমাদিগকে আহ্বান করিবেন, তখন আর কিছু না হউক, সহসা চৈতন্য হইবে।···আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদ্‌ভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই।"—ইংরেজ ও ভারতবাসী, পৃঃ ৪০৩।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনাশ্রিত ঐতিহাসিক নাটকে আমরা একাধিকবার এই 'গুরুর' সাক্ষাৎ পাই।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথের এই যে স্বদেশবোধের কথা বলা হ'ল, তাঁর ঊনবিংশ শতকের 'বালক' এবং 'ভারতী' পত্রিকার প্রবন্ধগুলিতে জাতীয়তাবোধের এই পূর্ণাঙ্গ পরিণত রূপটি দেখা যায় না। উত্তরকালের এই গভীর উদার জাতীয়তাবোধের আভাস, কিংবা সমসাময়িক সংকীর্ণ জাতীয় আন্দোলনের প্রতি বিতৃষ্ণা, তাঁর এই সময়কার প্রবন্ধেতর কোন কোন রচনায় মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১২৯৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'ভারতী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধক একটি গানের [১] অংশ বিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে :

"মিছে কথার বাঁধুনি কাঁদুনির পালা—
চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
ব'হে ব'হে নতশির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি একী লাজ
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ।
আপনি করিনে আপনার কাজ
পরের 'পরে অভিমান"।

বোঝা যাচ্ছে, আত্মশক্তির উদ্বোধন না ঘটিয়ে, ঊনবিংশ শতকের জাতীয় আন্দোলনের যে একান্ত পরনির্ভরতা দেখা দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনতি পরিণত প্রজ্ঞাতেই এর অসম্পূর্ণতার কথা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর এই পর্বের ছদ্ম-ঐতিহাসিক নাটকগুলিতেও ঐ মনোভাবের পরোক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় বলেই আমাদের বিশ্বাস। বিশেষভাবে এই দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা এবার তাঁর নাটকগুলিকে একে একে আলোচনা করব।

১। 'বুতপারিনে সঁপিতে প্রাণ'।

প্রথমেই 'রুদ্রচণ্ডের' কথায় আসা যাক। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের বিংশতি বৎসর বয়সের এই অপরিণত রচনাটিকে আদৌ নাটক আখ্যা দেওয়া যায় কিনা, সে প্রশ্ন স্বাভাবিক। একমাত্র কথোপকথন ছাড়া নাট্য-বন্ধের আর কোনো লক্ষণই এতে দেখা যায় না, এমন কি সাধারণ অঙ্কবিভাগ পর্যন্তও এখানে বর্জিত। ঘটনা বা চরিত্রেও কোনো নাটকীয় বিকাশ নেই। নিছক কারুণ্য-সঞ্চারের উদ্দেশ্যে শেষ দৃশ্যে অকারণ মৃত্যু দেখানো হয়েছে। এই সমস্ত কারণেই বোধকরি সমালোচক Edward Thompson রুদ্রচণ্ড সম্বন্ধে বলেছেন : "The piece is poor melodrama,"—Poet and dramatist, Pp. 30.

নাটকটিকে ঐতিহাসিক বলারও কোনো কারণ নেই। পৃথ্বিরাজ ও মহম্মদ ঘোরী এ-দু'টি নাম ছাড়া ইতিহাসের কোনো বিশেষ উল্লেখ এতে নেই। নাটকটির মূলকাহিনীটুকুও কাল্পনিক। রবীন্দ্র-জীবনী-রচয়িতা শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে, এটি রবীন্দ্রনাথের লুপ্ত-বাল্যরচনা 'পৃথ্বিরাজ পরাজয়ে'র সঙ্গে ক্ষীণ সূত্রে সম্পৃক্ত।

নাটক ও ইতিহাস—এই উভয়গত ব্যর্থতা সত্ত্বেও একটি বিষয়ে রুদ্রচণ্ডের মূল্য অনস্বীকার্য। ক্রম-পরিণতির পর্বে-পর্বে রবীন্দ্রনাথের ছদ্ম-ঐতিহাসিক নাটকে যে উদার জাতীয়তা-বোধের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আলোচ্য নাটকটিতে অস্পষ্টতা-সত্ত্বেও তার প্রাথমিক আভাস প্রচ্ছন্ন। নাটকটিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের দুটি চিত্র দেখানো হয়েছে। একটি স্বজাতীয় পৃথ্বিরাজের বিরুদ্ধে পরাজিত এবং নির্বাসিত রাজা রুদ্রচণ্ডের অস্ত্র-সাধনা। এটি-ই নাটকের প্রত্যক্ষ মৌল ঘটনা। অন্যটি পরোক্ষ এবং বিজাতীয়। আক্রমণকারী বিদেশী শত্রু মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে পৃথ্বিরাজের স্বাধীনতা-সংগ্রাম। আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় ঐতিহাসিক নাটকে যবন আক্রমণাত্মক হিন্দু-স্বাধীনতা সংগ্রামের যে চিত্তরঞ্জক লক্ষণগুলি আলোচনা ক'রে এসেছি, বলা বাহুল্য এই নাটকেও পৃথ্বিরাজ-ঘোরীর সংগ্রাম বর্ণনায় তার প্রচুর অবকাশ ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, রুদ্রচণ্ডের কোথাও সেই মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই। পৃথ্বিরাজের অসাধারণ জনপ্রিয়তার কথা বলা হয়েছে বটে, এবং তাঁর জন্য নাগরিকবৃন্দের বিনিদ্র উদ্বেগের কথাও জানিয়েছেন নাট্যকার, কিন্তু কোথাও তাঁকে 'পুরুবিক্রমে'র পুরু কিংবা 'অশ্রুমতী'র প্রতাপের মত অখণ্ড ভারতের জাতীয় প্রতিনিধি হিসাবে কীর্তিত করা হয়নি। এর থেকে বোঝা যায়, সমসাময়িক উগ্র স্বদেশিয়ানাকে রবীন্দ্রনাথ

এমন কি তাঁর অপরিণত বয়সের নাট্য-রচনাতেও আমল দেননি। এমন কি রুদ্রচণ্ড কর্তৃক মহম্মদ ঘোরীর দূতকে প্রত্যাখ্যানের মধ্যেও রুদ্রচণ্ডের কোনো স্বজাতিবোধের পরিচয় দেওয়া হয়নি। এটিকে দেখানো হয়েছে একান্ত ব্যক্তিগত ঈর্ষাপ্রসূত ব'লে। তার উক্তি ঃ

"মহম্মদ ঘোরী ?
কেন আমার কি কাছে ছুরি নাই মূঢ় !
এতদিন বক্ষে তারে করিনু পোষণ,
প্রতি দণ্ডে দণ্ডে তারে দিয়েছি আশ্বাস।
আজ কোথা হ'তে আসি মহম্মদ ঘোরী
তাহার মুখের গ্রাস লইবে কাড়িয়া ?"

পৃথ্বিরাজকে ঘি'রে যে স্বদেশ বা স্বজাতিবোধের অবকাশ ছিল, রবীন্দ্রনাথ তা মোটেই ব্যবহার করেননি। যদিও বাল্যকাল থেকেই যুদ্ধের আস্ফালন-সর্ব্বস্ব স্বাদেশিকতার আবহাওয়াতেই তিনি লালিত।

দ্বিতীয়ত নায়ক রুদ্রচণ্ডের চরিত্র পরিকল্পনাতেও রবীন্দ্রনাথের উত্তর কালের একটি শ্রেষ্ঠ ধারণার পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। এই নির্বাসিত রাজা পরাধীনতার জ্বালায় শত্রুকে হননে বদ্ধ পরিকর। ইনি প্রতিজ্ঞায় অটল, সংকল্পে অ-নড়। এই জন্য তিনি তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে শক্তি সাধনায় নিরত। কিন্তু সমস্ত মানবিক সম্পর্ক অস্বীকার ক'রে যে সাধনা কেবল তামসিক শাস্ত্রচর্চ্চায় নিমগ্ন, রবীন্দ্রনাথ চিরকালই তাঁর ব্যর্থ পরিণামের কথাই জানিয়ে এসেছেন। তাঁর আরাধ্য ছিল শিবময় শক্তি, কল্যাণময় শৌর্য। এই সমন্বয় ছিল না বলেই রুদ্রচণ্ড তার সমস্ত আয়োজন নিয়েই ব্যর্থ হয়েছে—তার সমাপ্তি হয়েছে আত্মহননে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের একাধিক নাটকে ঐ একই মনোভাবের আরও পরিণত অভিব্যক্তি দেখা যায়। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে (বৌ ঠাকুরাণী হাটের নাট্য রূপ) প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের শৌর্য সাধনার ব্যর্থতায়, এমন কি 'রক্তকরবী'র 'রাজার' ধুলি-লুণ্ঠিত পরিণতিতে, আমাদের এ-উক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে বলেই বোধ হয়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যে সন্ত্রাস-বাদী দলের সৃষ্টি হয় রবীন্দ্রনাথ বরাবরই তাদের কার্যকলাপকে ধিক্কার দিয়ে এসেছেন। সে-ও ঐ একই মনোভাবেরই অভিক্ষেপ।

রুদ্রচণ্ড-নাটকের আর একটি লক্ষণীয় বিষয়, এর একাদশ দৃশ্যে নাগরিকগণের প্রসঙ্গ। রুদ্রচণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনেক উর্ধ্বে পৃথ্বিরাজ যে যোদ্ধ-হিসাবে

উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তার কারণ সাধারণ নগরবাসীর হৃদয়ে তাঁর স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন ঃ

"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিল্‌বো কী সর্তে।"

দেশনেতাকে যে দেশবাসীর হৃদয়েই আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হ'বে—একথা আমরা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের উক্তিতে লক্ষ্য করেছি। এখানে পৃথ্বিরাজ যদিও সেই অর্থে দেশ-নেতা ন'ন, তবু নায়ক হিসাবে তাঁর যেটুকু সার্থকতা তা ওই সাধারণের সহযোগের জোরেই। রবীন্দ্রনাথের এই ধারণাটি পরবর্তী নাটক 'রাজা ও রানী'তে কুমারসেনের চরিত্রাঙ্কণে আরও স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে। আমরা এবার সেই আলোচনাতেই আস্‌ব।

'রাজা ও রানী' (১৮৮৯) ঃ রুদ্রচণ্ডে রবীন্দ্রনাথের নাট্যবন্ধ অপরিণত। 'রাজা ও রানী' সেই ত্রুটি বিমুক্ত। কিন্তু এখনও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নাট্যবন্ধের সূচনা হয় নি। 'রাজা ও রানী' পঞ্চাঙ্ক বিন্যাসের পুরাতন প্রথাতেই রচিত। কিন্তু, রীতিতে পুরাতনের অনুগমন করলেও, এরকম কোনো ধারণা করার প্রয়োজন নেই যে, রবীন্দ্রনাথ এ-নাটকে তৎকাল-প্রচলিত ঐতিহাসিক রচনার অনুবর্তন মাত্র করেছেন। বস্তুত, 'রাজা ও রানী'র সঙ্গে ইতিহাসের কোনো ক্ষীণতম সম্পর্ক পর্যন্তও নেই। নামেই এটি ইতিহাস। কথাটি অতিরঞ্জিতও নয়, বরং আক্ষরিক অর্থেই এ-উক্তিটি গ্রহণীয়। 'রাজা ও রানী'তে পাত্র পাত্রীর নামকরণেই যা-কিছু ঐতিহাসিক আমেজ আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। জালন্ধররাজ বিক্রম দেব, কাশ্মীর রাজ চন্দ্রসেন, যুবরাজ কুমারসেন, অমরুরাজ, অথবা মিহিরগুপ্ত, গৌর সেন, যুধাজিৎ, উদয় ভাস্কর[১]—ইত্যাদি নাম স্মরণীয়। ইতিহাসের পাতায় এঁদের কীর্ত্তির কোনো উল্লেখ না থাকলেও, নামগুলিতে যে ঐতিহাসিক ধ্বনির প্রতারণা আছে, শুধু মাত্র সেইটুকুই এখানে কাজে খাটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রেম ও অধিকার বোধের যে শাশ্বত সংঘর্ষের কথা 'রাজা ও রানী' নাটকের বক্তব্য[২] তাতে দূর কালের কোনো ঐতিহাসিক পটভূমির কোনো একান্ত অনিবার্যতা আছে ব'লে মনে হয় না। 'রাজা ও রানী'র ঘটনা কাল বিংশতি শতক ধরে' নিলেও নাটকের কিছু আসে যায় না। Shakespeare-এ লক্ষ্য করা যায়, তিনি দু'শ্রেণীর ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। একটিতে ইতিহাসের প্রত্যক্ষ উল্লেখ।

১। দ্রষ্টব্য ঃ—দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।
২। 'রাজা ও রানী'র পরবর্তী রূপায়ণ 'তপতী'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

সমালোচক Dowden তার তালিকা দিয়েছেন (1) Richard III, (2) Henry IV, Part I, (3) Henry IV, Part II ও (4) Henry V.

অন্যটিতে, ইতিহাসের উল্লেখ পরোক্ষ। যেমন Hamlet, Macbeth, Othello ইত্যাদি। ইতিহাস সেখানে পৃটভূমিমাত্র। 'রাজা ও রানী' অনেকটা এই শেষোক্ত শ্রেণীর প্রায় সগোত্র।[১]

'রাজা ও রানী' নাটকে মানুষের একটি চিরন্তন সমস্যার কথাই মূল বিষয় হলেও, কয়েকটি ক্ষুদ্রতর সমস্যার অবতারণায় এর মধ্যে উনবিংশ শতকের জাতীয়তা বোধের আভাস লক্ষ্য করেছেন কোনো কোনো সমালোচক। এ-প্রসঙ্গে 'রাজা ও রানীর' গল্পাংশটি স্মরণীয়। তা' হ'ল জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেব কাশ্মীররাজ দুহিতা রাণী সুমিত্রার প্রতি এমন প্রেমমুগ্ধ যে, রাজকার্য পরিচালনায় তাঁর বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই। তাঁর সেই ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে সুমিত্রার আত্মীয় কাশ্মীরের অমাত্যরা জালন্ধরে স্বৈরাচারী প্রভুত্ব বিস্তারে তৎপর। নিরুপায় সুমিত্রা অবশেষে রাজাকে পরিত্যাগ করে কাশ্মীরের যুবরাজ ভ্রাতা কুমারসেনের সঙ্গে মিলিত হলেন। উদ্দেশ্য, জালন্ধরের কাশ্মীরী শাসকদের দমন এবং স্বামী বিক্রমদেবের মোহ-বিমোচন। কিন্তু সুমিত্রা ছেড়ে যাওয়ায় বিক্রমদেবের কামনার মোহ রূপান্তরিত হল রণ-লিপ্সায়। তিনি কাশ্মীর পর্যন্ত অধিকার করলেন। কিন্তু কুমারসেনের প্রতি অমরুরাজকন্যা ইলার গভীর প্রেমানুরাগ লক্ষ্য ক'রে এবং একই সঙ্গে রেবতীর বিপরীত মনোভাবের পরিচয় পেয়ে সক্ষোভ আত্মোপলব্ধিতে তাঁর যুদ্ধোন্মাদনা হঠাৎ স্তব্ধ হল। শেষ পর্যন্ত, কুমারসেন ও সুমিত্রার দ্রুত মৃত্যু পরম্পরায় মর্মান্তিক বেদনার মধ্য দিয়ে তাঁর আত্মোপলব্ধি সম্পূর্ণ হ'ল। পরিবেশনার দোষে নাট্যকারের এই বক্তব্য অস্পষ্ট থেকে গেছে কিনা, কিংবা ভাবের অপরিণত উপলব্ধিই পরিবেশনায় দোষের সঞ্চার ঘটিয়েছে কি না, সে তর্কে আমরা প্রবৃত্ত হ'ব না। আমরা শুধু নাটকটির উল্লিখিত ঘটনা থেকে এইটুকুই লক্ষ্য করতে পারি যে, বিক্রমদেব বা সুমিত্রার ব্যক্তিগত জীবনের রহস্যই পাঠকের আগ্রহকে ধ'রে রাখে। বিদেশী উচ্ছেদ হ'ল কি না, কিংবা জালন্ধর স্বদেশবাসিরই সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনে এল কিনা, সে সম্বন্ধে পাঠকের ঔৎসুক্য না থাকারই কথা। কিন্তু পূর্বোক্ত মূল ঘটনার বহির্দেশে নাটকটিতে বৈদেশিক শাসনের প্রতি ইতস্তত

১। কল্‌হণের রাজ-তরঙ্গিণীর সঙ্গে পৃষ্ঠা মিলিয়ে পড়তে গেলে 'রাজা ও রানী'র পাঠক-কে হতাশ হ'তে হ'বে। তথ্য-গত ঐতিহাসিকতায় রবীন্দ্রনাথের নাটক মুক্তি খোঁজেনি, খুঁজেছে সাহিত্য-গত ইতিহাস-রসে। দ্বিতীয়টির পরিমাপে 'রাজা ও রানী' নিঃসন্দেহে শিল্পোত্তীর্ণ।

কটাক্ষ থাকায় কোনো কোনো সমালোচক একে রাজনৈতিক চেতনাশ্রিত ঐতিহাসিক নাটক বলার পক্ষপাতী। Edward Thompson এ-বিষয়ে বলেছেন :

"The play has a double meaning, it had a political reference, which helps to explain its very considerate measure of popularity on the stage. The Minister's reply to the king's demand that his generals turn the aliens out—'Our general is a foreigner'—this, repeated by the king himself, is almost the burden of the play. Later, the king of Kashmir indignantly repudiates the suggestion that his son came before Bikram's courts, to be condemned or forgiven by a 'foreigner'. Non-co-operation is here in the germ, a generation before Mr. Gandhi launched it."—Rabindranath Tagore—Poet and Dramatist : Edward Thompson (Pp., 88—89).

'রাজা ও রানী' সম্বন্ধে এ-উক্তি সম্পূর্ণ গ্রহণীয় নয় বলেই আমাদের বিশ্বাস। একথা ঠিক, নাটকটিতে 'বিদেশী' শব্দটির পৌনঃপুনিক ব্যবহার দেখা যায়। মন্ত্রী রাজ্যের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

"রাণীর কুটুম্ব যত বিদেশী কাশ্মীরি
দেশ জুড়ে বসিয়াছে।.........
বিদেশীর অত্যাচারে জর্জর কাতর
কাঁদে প্রজা।.........
বিদেশী অমাত্য যত
বসে বসে হাসে।"—
(১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য।)

দেবদত্তও তার স্বভাব-সুলভ শ্লেষে বলেছেন :

".........এসেছে বিদেশ হতে.
রিক্ত হস্তে, সে কি শুধু দীন প্রজাদের
আশীর্বাদ করিবারে দুই হাত তুলে ?"
(১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য।)

স্বয়ং কুমারসেনও চরম আবেদনের সঙ্গে সুমিত্রাকে প্রশ্ন করেছেন :

".........পিতৃ সিংহাসনে
বসি বিদেশের রাজা দণ্ড দিবে মোরে
বিচারের ছল করি—একি সহ্য হবে ?"—৫ম অঙ্ক, ৮ম দৃশ্য।

বস্তুত, কুমারসেনের আত্মোৎসর্গ যে তার দেশাত্ম-অভিমান-প্রসূত, নাটকটিতে এ-কথা সুস্পষ্ট। শংকরের উক্তিতেও তারই প্রমাণ।

এই সমস্ত দৃষ্টান্তের জন্য আপাত-পাঠে নাটকটিকে ঐ যুগের স্বজাতিবোধের দ্বারা আক্রান্ত মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক যুগের দেশাত্মবোধের নামে সঙ্কীর্ণ ভেদাভেদের কথা, এ-নাটকে কোথাও বলেন নি। বিদেশী বলেই ইংরেজ ঘৃণ্য, এমন ধারণা রবীন্দ্রনাথ কখনই পোষণ করতেন না। বরং ভারতবর্ষের ইতিহাসে পর-কে আপন করার ধারাটিকেই তিনি সগৌরবে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। 'রাজা ও রানী' রচনার পর কয়েক বছরের মধ্যেই একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

"কিছুকাল পূর্বে এক সময় ছিল যখন আমাদের স্বদেশ প্রেমিকগণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন যে, হিন্দুধর্মে উদারতা বিশ্বপ্রেম নির্বিচার আতিথ্য অন্য সকল ধর্ম অপেক্ষা অধিক। ......কিন্তু কালক্রমে লোকাচার এমন অনুদার ও বিকৃত হইয়া আসিয়াছে যে কোনো বিদেশীয় বিজাতীয় সাধু ব্যক্তি যদি আমাদের দেশে উপস্থিত হইয়া প্রীতি পূর্বক আমাদের মধ্যে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কেনো হিন্দুগৃহে তাঁহাকে সমাদরের সহিত অসঙ্কোচে স্থান দেয় না।—'বিদেশী অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য', রচনা কাল ১৩০১ বঙ্গাব্দ।

রবীন্দ্রনাথের উদার মানবতা-বাদ তাঁকে কখনই স্বজাতিহিতৈষী করতে গিয়ে বিজাতি-বিদ্বেষী করে তোলেনি।

প্রথম পর্বের রচনা হ'লেও 'রাজা ও রানী' সম্বন্ধেও এই উক্তি প্রযোজ্য। এখানে বিদেশীদের (Thompson এর ভাষায় Foreigner) বিষয় বারংবার উল্লিখিত হয়েছে বটে, কিন্তু কোথাও শুধু বিদেশী বলেই তাদের ঘৃণ্য প্রতিপন্ন করা হয় নি। জয়সেন যুধাজিৎ এরা আগে অত্যাচারী শাসক, পরে কাশ্মীরি। অন্তত, রবীন্দ্রনাথ তাই-ই বলতে চেয়েছেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবটি সুমিত্রার একটি ছোট উক্তিতেই সমগ্রভাবে নিহিত। বিক্রমদেব যখন এই প্রজাপীড়ক ক্ষুদে শাসকদের আত্মীয় বলে সুমিত্রার কাছে বোঝাতে চেয়েছেন, সুমিত্রার মুখ দিয়ে তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথেরই একটি বাণী শুনতে পাই :

"......................সিংহাসন
রাজচ্ছত্রছায়ে ফিরে যারা গুপ্তভাবে
শিকার সন্ধানে—তারা দস্যু, তারা চোর।"

(১ম অংক ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

বলা বাহুল্য, কেবল জাতীয়তাবোধ দিয়ে এ-উক্তির ব্যাখ্যা করতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। রাজনীতির সীমা ছাড়িয়ে এটি সত্য উপলব্ধির স্তরে উত্তীর্ণ।

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি সে যুগের কংগ্রেসের 'আবেদন নিবেদনে'র মনোভাবকে রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে তীব্র নিন্দার সঙ্গে ধিক্কৃত করেছেন। তাঁর প্রথম যুগের দু'একটি গানেও আমরা এর পূর্বাভাস লক্ষ্য করেছি। দুর্বলের সাশ্রু প্রার্থনায় যে প্রকৃত অধিকার লাভ করা যায় না, এর জন্য প্রয়োজন যে আত্মশক্তির উদ্‌বোধ, 'রাজা ও রানী'তে দেবদত্তের নিপুণ ব্যঙ্গোক্তিতে সেই কথা অনেক আগেই ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। উদাহরণ হিসাবে ১ম অংক, ২য় দৃশ্যে জালন্ধরের উৎপীড়িত প্রজাদের জল্পনা সভায় দেবদত্তের তীক্ষ্ণ বক্রোক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি জনৈক 'অস্ত্রোদ্যত' প্রজাকে লক্ষ্য করে বলেছেন……"তোমাদের বল কী? না, 'দুর্বলস্য বলং রাজা'—কিনা, রাজাই দুর্বলের বল। আবার, 'বালানাং রোদনং বলং' রাজার কাছে তোমরা বালক বই নও। অতএব এখানে কান্নাই তোমাদের অস্ত্র।"

এ উক্তির যথার্থ লক্ষ্য যে তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

রবীন্দ্রনাথের পরিণত ধর্মবোধে দেখা যায়, তিনি ঐতিহ্যের (tradition) পক্ষপাতী, কিন্তু প্রথাগত সংস্কারের (convention), প্রথাগত গতানুগতিকতার চির-শত্রু। বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই ধর্মের অস্তিত্বকে তিনি কোনোদিন স্বীকার করেন নি। জীবনের সত্য-উপলব্ধির পথ ছে'ড়ে আচারের সংকীর্ণ আবর্তের মধ্যে ধর্মকে সংরক্ষণ করার জন্যই যে আমাদের জাতীয়জীবন পঙ্গু হয়ে উঠেছে একথা রবীন্দ্রনাথে বারংবার উচ্চারিত। উত্তরকালে এই বোধকে আশ্রয় করেই তিনি 'অচলায়তন' নাটকটি রচনা করেন। 'রাজা ও রানী'তেও এই বোধের পূর্বাভাস দুর্লভ নয়। অবশ্য 'অচলায়তনে' এই বোধের যে একটি সমগ্র পরিণত রূপায়ণ দেখা যায় 'রাজা ও রানী'তে স্বাভাবিক কারণেই সেটি সম্ভব হয়নি। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সের রচনা বলে এখানে আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে কবির বিদ্রূপ একটু বেশিমাত্রায় তীক্ষ্ণ ও শানানো। তৎসত্ত্বেও, দেবদত্তের শ্লেষপূর্ণ স্বজাতি পরিচয়ে, কিংবা দেবদত্ত-ত্রিবেদীর চরিত্র-বৈপরীত্যে যথার্থ ধর্মাচরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব স্পষ্ট প্রকাশমান। নাটকটির সুরুতেই দেখি দেবদত্ত, ত্রিবেদীর (আচার-সর্বস্ব পুরোহিত শ্রেণীর প্রতিনিধি) পরিচয় দিচ্ছেন এইভাবে:

"শাস্ত্রহীন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন যদি
আছেন ত্রিবেদী ; অতিশয় সাধুলোক ;
সর্বদাই রয়েছেন জপমালা হাতে :
ক্রিয়া-কর্ম নিয়ে, শুধু মন্ত্র উচ্চারণে
লেশমাত্র নাই তার ক্রিয়াকর্ম জ্ঞান।"

(১ম অংক, ১ম দৃশ্য)

রবীন্দ্রনাথ এই আচার-সর্বস্ব মূঢ়তাকে চরম ব্যঙ্গ করেছেন ত্রিবেদীর মুখ দিয়েই কথাটিকে স্বীকার করিয়ে নিয়ে। ১ম অংক, ৮ম দৃশ্যে সে নিজেই বলেছে :—

"আমার কি বেদের উপর কম ভক্তি ? আমি বেদ পূজা করি, তাই বেদ পাঠ করবার সুবিধে হয়ে ওঠে না। চন্দনে আর সিঁদুরে আমার বেদের একটি অক্ষরও দেখবার জো নেই।"—

এই সমস্ত উক্তিতে সে যুগের ধর্মসংস্কারকের উষ্ণতা অল্পবিস্তর সঞ্চারিত হয়ে থাকলেও এর অন্তর্নিহিত সত্যটুকু রবীন্দ্রনাথের আপন উপলব্ধিতেই অর্জিত।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ জাতীয় নেতার অপরিহার্য লক্ষণ নিবিড় গণ-সংযোগ। তাই দেখা যায়, প্রথমাবধিই তাঁর নাটকের বীর চরিত্রেরা দেশবাসীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভালবাসার ডোরে সংবদ্ধ। এই ভালবাসাকে রাজনৈতিক নেতার জনপ্রিয়তা ব'লে ভুল করা উচিত নয়। রাজনৈতিক নেতার যে জনপ্রিয়তা তাতে উচ্ছ্বাস আছে, গভীরতা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গুরু দেশবাসীরই একান্ত অন্তরের ধন।[১] আদর্শ দেশ-নেতার এই পরিণত উপলব্ধি এই নাটকে না থাকলেও, গণ-সহযোগের প্রাথমিক আভাস এখানে পাওয়া যায়। 'রুদ্রচণ্ডে'ও দেখেছি, নগরবাসীর হৃদয়সিংহাসনেই পৃথ্বিরাজের প্রতিষ্ঠা। 'রাজা ও রানী'তে সুমিত্রার বীরভ্রাতা কুমারসেনেরও তাই। শেষ অংকের ৬ষ্ঠ দৃশ্যে দেখি, অরণ্যে আশ্রিত সম্পূর্ণ নিরস্ত্র কুমারসেনকে জালন্ধর রাজ তাঁর সমস্ত সশস্ত্র শক্তি নিয়েও বন্দী করতে পারছেন না।[২] কারণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, রাজসিংহাসন ছেড়ে কাঠুরিয়া, মধুজীবি, শিকারী প্রভৃতি সাধারণ অরণ্যচারীর সত্যসিংহাসনেই অজেয় রাজকুমারের যথার্থ অধিষ্ঠান। আর এই লোক-সম্পৃক্তিই কুমারসেনের অভেদ্য বর্ম। সাধারণ মানুষের এই শোভাযাত্রা এবং তারই মাঝে প্রকৃত দেশনায়কের অধিষ্ঠান, রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালের নাটকে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ

১। ধনঞ্জয় বৈরাগী স্মরণীয়।
২। 'রক্তকরবী'র প্রতাপান্বিত রাজাও রঞ্জনকে বন্দী করতে পারেন নি।

করেছে। এখানে তারই সূচনা। আর একটি আদর্শে রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর বীর নায়কেরা বিশিষ্ট। পশুশক্তির নিষ্প্রয়োজন আস্ফালনকে তিনি বীরত্ব ব'লে মানেন নি। 'বীর শোক অশ্রু নহে, অসির ঝংকার' (কুরুক্ষেত্র : নবীন সেন) এরকম কথা রবীন্দ্রনাথ বড় একটা বলেন নি। তাঁর বীরত্বের ধারণা অনেকটা বৌদ্ধ অশোকের মত—ক্ষমাধর্মী। 'রাজা ও রানী'তে কুমারসেন বলেছেন :

> "যুদ্ধ বীরধর্ম বটে, ক্ষমা তার চেয়ে
> বীরত্ব অধিক।" – ৪র্থ অংক, ৩য় দৃশ্য।

পরবর্তী একাধিক নাটকে এই ভাবের বিস্তার লক্ষ্য করা যায়।

জাতীয় এবং ধর্ম আন্দোলনের অনুষঙ্গে এই যুগের নারী-জাগৃতি আন্দোলনও এই নাটকে সূক্ষ্মদেহে প্রবেশলাভ করেছে। সুমিত্রা চরিত্রের মধ্যে যে স্পষ্ট ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় অনেকেই তার মধ্যে নারী-প্রগতির চিহ্ন দেখেছেন। সমালোচক Edward Thompson এ-চরিত্রটির সঙ্গে Doll's House-এর 'Nora' চরিত্রটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নাটকটির পরিণতি-দৃশ্যের শোচনীয়তা থেকে বোধ হয়, সুমিত্রার কঠোর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রবীন্দ্রনাথের অবিমিশ্র সমর্থন লাভ করেনি। নাটকটির শেষ দিকে সুমিত্রা নিজেও রেবতীকে বলেছে :

> "নারী হয়ে
> রাজকার্যে দিয়োনা দিয়োনা হাত। ঘোর
> অমঙ্গল পাশে সবারে আনিবে টানি,
> আপনি পড়িবে। হেথা হতে চলো ফিরে
> দয়া মায়া হীন ওই সদা ঘূর্ণমান
> কর্মচক্র ছাড়ি। তুমি শুধু ভালোবাসো,
> শুধু স্নেহ করো, দয়া করো, সেবা করো,—
> জননী হইয়া থাকো প্রাসাদ-মাঝারে।
> যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব রাজ্যরক্ষা আমাদের কার্য
> নহে।" (পঞ্চম অংক, প্রথম দৃশ্য।)

সুমিত্রা চরিত্রের উত্তর অধ্যায়ের এই প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মানসেরই সম্যক্ প্রতিফলন। রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন যে, 'রাজা ও রানী' রচনার বৎসরে রবীন্দ্রনাথ পুণায় সে-যুগের অন্যতম প্রগতিবাদী মারাঠী মহিলা 'রুমাবাই'-এর স্ত্রী-

স্বাধীনতার ওপর বক্তৃতা শুনতে যান। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব তিনি এ-সময়কার কয়েকটি চিঠিতে প্রকাশ করেন। সে-সব চিঠি থেকে জানা যায়; নারীর স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকার করলেও পুরুষের সঙ্গে নারীর সর্ববিষয়ে সমকক্ষতার কথায় তিনি আস্থাবান ছিলেন না। পরবর্তীকালে এবিষয়ে তাঁর কিছু কিছু মত-পরিবর্তন ঘটে থাকলেও, 'রাজা ও রানী' রচনার পর্বে এই ছিল তাঁর ধারণা। সুমিত্রা চরিত্রের পরিণতিই তার প্রমাণ।

বিসর্জন (১৮৯০): 'রাজা ও রানী' রচনার পরের বছরেই পঞ্চাঙ্ক প্রথায় আরো একটি ঐ শ্রেণীর নাটক হ'ল বিসর্জন। এটিও পুরোপুরি ঐতিহাসিক নয়, অর্ধ-ঐতিহাসিক। অবশ্য 'রাজা ও রানী'র মত একেবারে ইতিহাস ভিত্তিহীন নয়। 'রাজা ও রানী' ছদ্ম ঐতিহাসিক, বিসর্জন অর্ধ-ঐতিহাসিক। এর বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী উপন্যাস 'রাজর্ষি' কাহিনীর প্রথমাংশ থেকে নেওয়া[১]। ২য় খণ্ড, রবীন্দ্র রচনাবলীর গ্রন্থ পরিচয়ে রাজর্ষির কাহিনী সম্বন্ধে বলা আছে,—

"ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য কবিকে গোবিন্দ মাণিক্যের ইতিহাস পাঠাইয়াছিলেন। তাহা রাজর্ষির প্রথম সংস্করণে পরিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। নক্ষত্ররায়ের ত্রিপুরা অধিকার ও গোবিন্দ মাণিক্যের স্ব-ইচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ এবং নক্ষত্ররায়ের মৃত্যুর পর গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্যভার পুনর্গ্রহণ প্রভৃতি এই ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে।"

কিন্তু তা' সত্ত্বেও নাটকের মূল ঘটনা বা সমস্যার সঙ্গে ইতিহাসের প্রত্যক্ষ যোগ এখানেও নেই। এর সমস্যা রবীন্দ্রনাথের বহু-আলোচিত একটি অতিপরিচিত সমস্যা। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়:

"এই নাটকে বরাবর এই দু'টি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে—প্রেম আর প্রতাপ"।—বিসর্জন নাটকের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

নাটকটির একদিকে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মাণিক্য—ইনি প্রেমের পূজারী। অন্যদিকে রঘুপতি, প্রতাপের পুরোহিত। জয়সিংহ এই দুই বিপরীত চিত্তবৃত্তির মধ্যে দোলায়মান একটি আত্মোৎসৃষ্ট চরিত্র। নারী-চরিত্রের মধ্যেও এই দুই বিপরীত মানসের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। এক, অপর্ণা। বাইরে থেকে বিত্তহীন। কিন্তু প্রেমের মানসমূর্তি। অন্যজন, স্বয়ং মহিষী গুণবতী, অপত্য-বোধ-বঞ্চিত নারীর হিংস্ররূপ। এইভাবে, একাধিক বিপ্রতীপ চরিত্রের সমাবেশে, এবং কখন কখন একই চরিত্রের ভিতর বিপরীত মনোভাবের সৃষ্টি করে' রবীন্দ্রনাথ এটিকে একটি চমৎকার দ্বন্দ্ব-

১। কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত "ত্রিপুরা রাজমালা" রাজর্ষি উপন্যাসের অবলম্বন।

সংঘাতময় নাটকে পরিণত করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর সঙ্গে নাটকটির ঐতিহাসিক কোন যোগ আছে বলে মনে হয় না। নাটকটির মৌল সমস্যাটি ঐতিহাসিক পটভূমিকার সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ-মাণিক্য কোনো বিশেষ দেশের বা অঞ্চলের রাজা নন, রবীন্দ্রনাথের পরিণত কালের নাট্য-রচনায় যে নির্বিশেষ রাজার পরিচয় পাওয়া যায়, ইনি তাদেরই একজন।

এই প্রসঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় নাটকটির পূর্ববর্তী উপন্যাস-রূপ (রাজর্ষি) সম্বন্ধে যা বলেছেন তা প্রণিধান-যোগ্য মনে করি। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের উপন্যাসে "বৈচিত্র্য কোলাহলময় রঙ্গভূমি ছায়ার মত অস্পষ্ট, ইতিহাস একটি অর্থহীন আশ্রয়মাত্র; ইতিহাসের জীবন ও উদ্দীপনা উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার কোনও পরিচয় কোথাও নাই"।—'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা'—নীহাররঞ্জন রায় (২য় খণ্ড) পৃঃ ২৭৭-৭৮।

রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রযুক্ত হয়েছে। তাঁর প্রথম যুগের ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে। শুধু লক্ষণীয় যে, নাট্য-রূপায়ণে এই ধরণের ঐতিহাসিক পটভূমিকার একটা ব্যবহারিক উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। 'বিসর্জন' নাটকে এই উপযোগিতা হ'ল,—প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ যাকে 'ইতিহাস-রস' বলেছেন তার উদ্রেক। ফলে, নাটকটির গুরুগম্ভীর বক্তব্য একটি মহান সমুন্নতি লাভ করেছে। এটি নাটকের ইতিহাস-বিমুক্ত সাধারণ বিবৃতি দ্বারা সহজে সম্পন্ন হ'ত না। দ্বিতীয়ত, নাটকটির মধ্যে যে নরবলির কথা আছে, বর্তমান যুগের মধ্যে সেটি অবিশ্বাস্য। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর 'কপালকুণ্ডলা'র কাপালিককে উপস্থাপিত করেছেন পরিচিত লোকালয় থেকে বহুদূরে একটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে। 'বিসর্জনে'ও এই দূরত্ব আনা হয়েছে কালগত ব্যবধানে। এ নাহ'লে সাধারণ পাঠকের কাছে বিষয়টির বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হ'ত। এ-ছাড়াও লক্ষণীয় যে, ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ থেকে স'রে এসে যে নিভৃত-গীতিকাব্যময়তায় রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি খণ্ডিত[১]; 'বিসর্জন' সেই দোষ থেকে অনেকটা বিমুক্ত। এখানে কর্ম-প্রাণতাই (action) মুখ্য। ঘটনা অসম্পৃক্ত গীতিকাব্যের উচ্ছ্বাস প্রায় নেই বল্লেই চলে। অবশ্য দু-একটি জায়গায় নাট্যকারের কাহিনী ছাপিয়ে কবির কণ্ঠ সুস্পষ্ট। যেমন ৩য় অংক, ৪র্থ দৃশ্যে জয়সিংহের উক্তিতে ঃ

১। 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

দেখ্ চেয়ে গোমতীর শীর্ণ জলরেখা
জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত—কলধ্বনি তার
এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ।
আকাশেতে অর্ধচন্দ্র পাণ্ডু মুখচ্ছবি
শ্রান্তিক্ষীণ—বহুরাত্রি জাগরণে যেন
পড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব
ঘুমভারে। সুন্দর জগৎ।"

পাঠক এখানে ঘটনার খেই হারিয়ে ফেলে কবিতার মুগ্ধ শ্রোতা। কিন্তু স্বীকার করতেই হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি-মানসের সহজ-প্রবণতা সত্ত্বেও পাঠককে এ নাটকে বড় একটা বিপথগামী করে দেননি। 'বিসর্জন' তাঁর নাট্য প্রতিভারই উজ্জল স্বাক্ষর।

'রাজা ও রানী'তে আচার-সর্বস্ব ধর্মাচরণের প্রতি যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ লক্ষ্য করা যায়, এবং যার সঙ্গে ঊনবিংশ শতকের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের যোগ প্রত্যক্ষ, 'বিসর্জনে' তার-ই একটি পরিণত রূপ লক্ষ্য করি। এখানে আচার-নিষ্ঠ ধর্মাচরণের প্রতিনিধি রাজমন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি। রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীকে রচনা করেছেন তাচ্ছিল্য-ভরে। হাল্কা হাস্যরসই তার চরিত্রের ফলশ্রুতি। কিন্তু পরাজিত প্রতিনায়ককে খেলো করে না আঁকাটাই রবীন্দ্রনাথের পরিণত নাট্যকলার বৈশিষ্ট্য। তা'ছাড়া ভালোর সঙ্গে মন্দের দ্বন্দ্বের ভিতর উন্নততর নাটকীয় সংঘাতের সম্ভাবনা কম। ভালোর সঙ্গে ভালোর দ্বন্দ্বেই এটি সাধ্য। তাই, 'বিসর্জনে' রঘুপতির চরিত্র মহিমান্বিত। অপর্ণার মুখের একটি বর্ণনাতেই রঘুপতি-চরিত্রের সম্যক্ পরিচয়ঃ

"কী কঠিন তীব্র দৃষ্টি! কঠিন ললাট
পাষাণ সোপান যেন দেবী মন্দিরের।"
(১ম অংক, ৩য় দৃশ্য।)

পাষাণ সোপানের এই ইংগিতময় উপমাটিতে শুধু যে রঘুপতি-চরিত্রের দার্ঢ্য এবং অক্ষমাকে ব্যক্ত করা হয়েছে তাই নয়। সোপানের মত রঘুপতিরও যে মন্দিরের বহির্দেশে আচারের ধুলিলিপ্ত অবস্থান এরকম একটি ব্যঞ্জনাও প্রচ্ছন্ন আছে বলে বোধ করি। এবং ওই 'সোপান'ই শেষ পর্যন্ত সত্য-দেবতার মন্দির প্রবেশের সহায়তা করেছিল, এ-কথাও 'বিসর্জন' পাঠকের ভোলা উচিত নয়। যাই হোক্ এই সংস্কার ও অন্ধ আচার-আচরণের বিরুদ্ধেই রবীন্দ্রনাথের আবহমান

বিদ্রোহ। আর তাঁর এই বিদ্রোহ প্রেমাত্মক, পশুশক্তির উত্তেজনায় হিংস্র নয়। নাটকটিতে রঘুপতির পশুশক্তিকে পরাজিত ক'রে জয়ী হয়েছে যে শক্তি তা সামান্য এক ভিখারিণী বালিকার রূপ ধ'রে উপস্থাপিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ

"প্রেমের সৈন্য সামন্ত অর্থ প্রতিপত্তি কিছুই নেই, কিন্তু, হৃদয়ের গোপন দুর্গে তার শক্তি সঞ্চিত হতে থাকে।" 'বিসর্জন'—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

বস্তুত, রঘুপতির চরম পরাজয় ঘটেছে তার নিজের কাছেই; জয়সিংহের মৃত্যুতে তার অবরুদ্ধ স্নেহপ্রাণতার অবারিত উন্মোচনে। প্রেম দিয়েই সে তার বিকৃত প্রতাপকে পরাজিত করতে পেরেছিল।

প্রেমের কাছে প্রতাপের এই পরাজয়ের কথা বর্তমান নাটকে ধর্মাচরণ প্রসঙ্গে প্রযুক্ত হলেও, রবীন্দ্রনাথের পরিণতকালের নাটকে এবং অন্যান্য রচনায় জাতীয় আন্দোলনের বিষয়েও ঐ কথাই বারংবার বলা হয়েছে। তাঁর ধনঞ্জয় বৈরাগীর দল এই পাশব আন্দোলনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্ভীক কণ্ঠে জানিয়েছে ঃ

> "আরো আরো প্রভু আরো আরো
> এমনি করে আমায় মারো।"—(মুক্তধারা)

কিংবা

> "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
> মোদের বাধন টুটবে ততই টুটবে"।—ইত্যাদি।

কিংবা

> "আমি ভয় করব না ভয় করব না
> দু'বেলা মরার আগে মরব না "···ইত্যাদি।

এই বোধ ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনের মুক্তিসাধককে স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে খুঁজে পান নি। তিনি বিশ্বাস করতেন স্বাধীনতার মত মহৎ সত্যকে লাভ করা যায় না কোনো অসদুপায় দিয়ে। তার পূর্বাভাস 'বিসর্জনে'ও আছে। রঘুপতি যখন প্রতিমার মুখ ফিরিয়ে দেবার হীনকৌশলে জনচিত্ত জয় করতে প্রয়াসী, তখন আত্মপক্ষ সমর্থনে শিষ্যের কাছে বলতে হয় ঃ

> "মূর্খদের কেমনে বোঝাব!······
> মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই।
> মূর্খ, তোমার আমার হাতে সত্য নাই।

সত্যের প্রতিমা সত্য নহে, কথা সত্য
নহে, লিপি সত্য নহে, মূর্তি সত্য নহে—
চিন্তা সত্য নহে। সত্য কোথা আছে—কেহ
নাহি জানে তারে, কেহ নাহি পায় তারে।"

—(৩য় অংক, ১ম দৃশ্য)।

বলা বাহুল্য, ধর্ম কিংবা জীবন সম্বন্ধে এই নৈরাজ্যবাদীর মনোভাব রবীন্দ্রনাথের ছিল না। সত্যের বিমল আলোকেই তিনি অভীষ্টকে অনুসন্ধান করতেন। তাঁর রাজনৈতিক চেতনারও মূল কথা তাই। এইজন্য দেখা যায়, তাঁর জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ নেতারা চতুর রাজনীতিবিদ বা কূটনৈতিক নন্। তাঁরা 'খোলা হাওয়া' 'গায়ে লাগিয়ে' মুক্তির সঙ্গীত কণ্ঠে নিয়ে সাধারণের 'হাটে বাটে' আবির্ভূত। তাঁরা বদ্ধঘরের চতুর চিন্তানায়ক নন, প্রকাশ্য মেলার বাউল বৈরাগী। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চেতনার পরিণত পর্বের নাটকে নানা নামে নানা পরিচয়ে ওই একই ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'বিসর্জনে' ঠিক এ-ধরণের চরিত্র না দেখা গেলেও, তার প্রাথমিক আভাস পাই অপর্ণার চরিত্রে। কিন্তু প্রাথমিক বলেই বোধ হয় নাট্য-ঘটনার মধ্যে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হতে পারেনি চরিত্রটি। অথচ, প্রতীক চরিত্রের মত নাটকের বহির্ঘটনার সঙ্গে নিঃসম্পর্কীয়ও নয় চরিত্রটি। বোধ করি এইজন্যই Edward Thompson মন্তব্য করেছেন:

Aparna, the beggar-girl, on whose deeds the whole plot turns, does not interest."—Rabindra Nath Tagore—The Poet and Dramatist—Pp-96.

তৎসত্ত্বেও অপর্ণার মধ্য দিয়েই যে "ক্ষুদ্র বালিকার বেশে সত্য প্রেমের দ্বার দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে বিশ্বমাতার মূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেল" (বিসর্জন—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) একথাও অস্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, অপর্ণার বিশ্বপ্রেমের সংস্পর্শে আসার পর দ্বন্দ্ব-জর্জর জয়সিংহের মুখে সে সঙ্গীতের দ্বার উন্মোচিত হ'ল, রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালের এই ধরনের নাট্য-রচনায় সেই বাউল গানের ধারাই নাটকের মর্মবাণী বহন ক'রে চির-প্রবহমান। প্রথম সূচনা ব'লে 'বিসর্জনে'র এই গানটির গুরুত্ব অসীম। তা'ছাড়া প্রেম ও প্রতাপের সে দ্বন্দ্বের কথা এতখানি আলোচনার পরেও অনুক্ত রয়ে গেল, গানটির নিরাভরণ ছোট্ট পরিসরে তা চমৎকারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। এই গান উদ্ধৃত করে আমরা 'বিসর্জনে'র আলোচনায় সমাপ্তি টান্‌বো।

"আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে

"আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে
সঙ্গে তোদের নিয়ে যারে।
তোরা কোন রূপের হাটে
চলেছিস ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে।
তোদের ঐ হাসিখুশি দিবানিশি
দেখে মন কেমন করে।
আমার এই বাধা টুটে—
নিয়ে যা লুটে পুটে—
পড়ে থাক মনের বোঝা ঘরের দ্বারে।
যেমন ঐ একনিমিষে বন্যা এসে
ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে॥
এত যে আনাগোনা,
কে আছে জানাশোনা,—
কে আছে নাম ধরে মোর ডাকতে পারে?
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে
চিন্‌তে পারি দেখে তারে" ॥

(—দ্বিতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য।)

'বিসর্জনে'র পর রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য পর্বে (১৮৭২-১৯০৪) আর এই ধরনের ছদ্ম-ঐতিহাসিক নাটক লেখেননি। 'মালিনী'তে অবশ্য ক্ষেমংকর প্রভৃতি নামকরণে, এবং 'নোতুন ধর্মের অভ্যুত্থান'—ইত্যাদি কথায় একটি ঐতিহাসিক আমেজ আনার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম বিকশিত বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সনাতন প্রথাগত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বিরোধ ও সংঘর্ষের ঐতিহাসিক পটভূমিটিও যেন এখানে অস্পষ্টভাবে অভিব্যঞ্জিত। সমালোচক Edward Thomsom তো স্পষ্টই বলেছেন : "In it what I venture to call his Buddhism finds utterance"—Rabindranath Tagore—Poet and Dramatist.

কিন্তু তা সত্ত্বেও 'বিসর্জনের' সমস্যাই এখানে পুনরালোচিত হয়েছে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। ক্ষেমংকরের মধ্যে রঘুপতি এবং মালিনীর মধ্যে অপর্ণা ও গোবিন্দ মাণিক্যের সম্মিলিত প্রতিচ্ছবি পড়েছে বলে বোধ হয়। রঘুপতির মত